ছায়ামৃত্যু

ছায়ামৃত্যু

মোশতাক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

ছায়ামৃত্যু উপন্যাসের রচনাকাল, পুলিশ অফিসার্স মেস, চট্টগ্রাম, ১৭.০২.২০২০ থেকে ২২.০৩.২০২০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Chayamrittu by **Mostaque Ahamed**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2020

Price : 350.00
US $ 15

ISBN 978 984 526 367 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
booklightbd@gmail.com
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল,
যেখানে জড়িয়ে আছে
আমার ভালোলাগা আর ভালোবাসার
অজস্র স্মৃতি।

১৯৮০ সাল।

পুলিশ খুব সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সবকিছু।

প্রথমে তারা পেল দারোয়ানের লাশ। সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। তিনটি গুলি লেগেছে শরীরে। দুটি বুকে, আরেকটি মাথায়। দেখলে বোঝা যায় খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠলে দোতলা। তারপর কয়েকটি বেডরুম। মাস্টার বেডরুমের সামনে অপরিচিত এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে আছে। মাথায় একটামাত্র গুলির চিহ্ন। রক্ত জমাট বেঁধে আছে মেঝেতে। মাস্টার বেডরুমে কিং সাইজের খাটের ওপর পড়ে আছে আরেকটি লাশ, তবে চাদর দিয়ে ঢাকা। চাদরের এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ। ওসি সাহেব ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন লাশটির কাছে। চাদর খানিকটা সরাতে বুঝলেন লাশটি একজন সুন্দরী নারীর। ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে তাকে। ছুরিটা পাশেই পড়ে আছে। ওসি সাহেব সাথে থাকা মহিলা পুলিশকে নির্দেশ দিলেন প্রয়োজনীয় সুরতহাল রিপোর্ট তৈরির জন্য। আর লক্ষ রাখতে বললেন যেন ছুরির বাঁটের আঙুলের ছাপ নষ্ট না হয়।

ওসি সাহেব ভেবেছিলেন ট্রিপল মার্ডার। মাস্টার বেডরুম-সংলগ্ন আরেকটি কক্ষে গিয়ে ভুল ভাঙল তার। ফ্যানের আংটার সাথে ঝুলছে চতুর্থ লাশটি। এই লাশটি এই বাড়ির মালিক খন্দকারের। প্রথমে ভেবেছিলেন বুঝি আত্মহত্যা। পরে ভুল ভাঙল, পায়ে গুলির ক্ষত আছে। তার মানে হত্যা করে কেউ তাকে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু কেন?

ইন্সপেক্টর মহিবুল বুঝতে পারছেন বড়ো কঠিন সময় পার করতে হবে তাকে। কারণ একটি বাড়িতে চারজন মানুষ খুন হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দ্রুত রহস্য উন্মোচন করতে না পারলে মারাত্মক

চাপ আসবে। হত্যাকারী যে একাধিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারা হত্যা করেছে চারজন নিরীহ মানুষকে? আর তাদের উদ্দেশ্যই বা কী?

চল্লিশ বছর পর। সাল ২০২০।

ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছেন শাফায়েত আহমেদ। তার ডানে বসেছেন তার স্ত্রী রুবিনা আহমেদ আর বামে মেয়ে নিদিয়া। শাফায়েত আহমেদ একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। দুটো বড়ো গার্মেন্টস আর একটি বায়িং হাউজের মালিক তিনি। ঢাকার বসুন্ধরায় দোতলা ডুপ্লেক্স বাড়িতে থাকেন। তাছাড়া বনশ্রীতে একটি দশ তলা বাড়ি আছে। ঐ বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন। গুলশানের সেন্ট্রাল প্লাজায় দুটো কমার্শিয়াল ফ্লোরের মালিক তিনি। ওগুলোর ভাড়াও আসে অনেক টাকা। এখন পরিকল্পনা করছেন গাড়ি আর রিসোর্টের ব্যবসা শুরু করার। অবশ্য কিছুটা সময় লাগবে।

রুবিনা আহমেদ গৃহিণী। স্বামী, সন্তান, সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। বাড়িতে বাবুর্চি, দারোয়ান, ড্রাইভার সবাই থাকলেও তার চোখ এড়ায় না কোনোকিছু। মেয়ে নিদিয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সমাজকল্যাণ বিভাগে অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। একমাত্র ছেলে নাহিয়ান পড়াশোনা করে অস্ট্রেলিয়ায়। পনেরো দিন হলো ছুটি কাটিয়ে আবার অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেছে। এই হচ্ছে তাদের ছিমছাম সুখের সংসার। সবকিছু মিলিয়ে এক কথায় তারা সুখি, সত্যি সুখী।

শাফায়েত আহমেদের পাতে ভাত তুলে দিলেন রুবিনা। তারপর বললেন, তাহলে আমরা আগামীকাল কুমিল্লা যাচ্ছি।

মাথা ঝাঁকিয়ে শাফায়েত আহমেদ বললেন, হ্যাঁ, নতুন বাড়িটা তোমাদের ভালোই লাগবে। আসলে ওটাকে একটা রিসর্ট বানাব। আগে নিজেরা কয়েকদিন থেকে আসি।

কতদিন থাকব বাবা?

এবার প্রশ্ন করল নিদিয়া।

তিনদিন।

এক সপ্তাহও তো থাকতে পারি। আমার ভার্সিটি বন্ধ।

এতদিন ভালো লাগবে না। অনেক পুরাতন বাড়ি, প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়েছে। তারপরও কিছু সমস্যা থাকতে পারে। জেনারেটর, এসি, গ্যাসের লাইন এগুলোতে টুকটাক কাজ করতে হবে। আপাতত তিনদিন থেকে আসি। পরে আবার যাব। নতুন এক কেয়ারটেকার রেখেছি। নাম হালিম, সেই সবকিছুর ব্যবস্থা করছে। স্থানীয় হওয়ায় সুবিধা আছে।

রুবিনা জিজ্ঞেস করলেন, খাওয়াদাওয়ার কী হবে?

বাসার বাবুর্চিকে আজই পাঠিয়ে দিয়ো, কুদ্দুছ ভালো রাঁধে, ও গেলেই হবে।

ঠিক আছে। আমরা রওনা দেবো কখন?

সকালের নাস্তা করে তারপর রওনা দেবো। পৌঁছে যাব দুপুরের আগে। আমি নিশ্চিত বাড়িটা তোমার ভালো লাগবে।

এবার নিদিয়া প্রশ্ন করল, বাড়িটার মালিক কে ছিল বাবা?

শাফায়েত সাহেব মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, বাড়িটা তৈরি করেছিল ইয়াকুব নামের এক ব্যক্তি। অল্প বয়সে তার মৃত্যু হয়। বাড়িটা তারপর থেকে ফাঁকা পড়ে ছিল। কোনো দাবিদার না-থাকায় সরকার গতবছর নিলামে তুলেছে। কিনে নিয়েছি আমি।

অনেক পুরাতন আমলের বাড়ি, তাই না?

না, অত পুরাতন না। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের হবে। তবে দেখতে খুব সুন্দর। শহরের প্রান্তে হওয়ায় মানুষের নজরে পড়েনি। ঢাকার আশেপাশে হলে অনেক দাম হতো। গত ছয় মাসে বাড়িটাতে অনেক কাজ করিয়েছি। নিঃসন্দেহে এখন যে-কারো ভালো লাগবে। বাড়িটাতে অনেক ফুল ফলের গাছ আছে, বড়ো বড়ো কাঠের গাছও আছে। এক একটা সেগুনগাছ এত মোটা যে কল্পনা করা যায় না। আমার বিশ্বাস ঐ গাছগুলোর বয়স পঞ্চাশ-ষাটের কম হবে না। বড়ো একটা পুকুরও আছে। টিলা আছে কতকগুলো।

তাহলে তো অনেক জায়গা নিয়ে বাড়িটা।

হ্যাঁ, পনেরো একর।

ওরে বাবা!

গেলে তোদের পছন্দ হবে। আসতে চাইবি না। ভালো লাগলে তোর ক্লাসের সবাইকে নিয়ে একবার বেড়াতে যাবি।

তা তো অবশ্যই। সবাই খুব খুশি হবে।

তোদের জন্যই তো এইসব করছি রে, সবই তোদের জন্য।

বা...বা... সবই আমাদের সবার জন্য। তাই না মা?

রুবিনা মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ডিম তুলে দিলেন নিদিয়ার প্লেটে।

নাস্তাশেষে নিদিয়া রুমে এলো। তারপর ফোন করল রোমেলকে। রোমেলের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক। এই বছর মাস্টার্স শেষ করে বের হয়েছে ভার্সিটি থেকে। বিসিএসও শেষ করেছে। অপেক্ষায় আছে রেজাল্টের। আপাতত চাকরি করছে একটা বিদেশি এনজিওতে। রোমেলের চাকরির একটা সুবিধা আছে। যখন খুশি তখন বের হতে পারে অফিস থেকে। এই যুগে এরকম চাকরি পাওয়া বড়ো ভাগ্যের ব্যাপার। নিদিয়া অবশ্য আশাবাদী, রোমেল বিসিএস পরীক্ষায় ভালো করবে এবং নিশ্চিত সে একটা ক্যাডারে যোগ দেবে। এখন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কের কথাটা কেউ জানে না। বিসিএস চাকরি হওয়ার পর বাবা-মাকে জানাবে বলে ঠিক করেছে সে।

রোমেল ফোন ধরে বলল, তুমি চিন্তা কোরো না, আমি ঠিক একটার সময় ভার্সিটিতে থাকব।

দুপুরে একসাথে লাঞ্চ করব।

অবশ্যই। দুপুরে কেন? পারলে রাতেও করব।

ফাজলামি কোরো না। বিকেলের পর থাকতে পারব না। বাসায় এসে কিছু গোছগাছ করতে হবে।

কেন?

তিনদিনের জন্য কুমিল্লা যাব। বাবা একটা নতুন বাড়ি কিনেছে, ওখানে থাকব। বাড়িটা নাকি খুব সুন্দর। যে-কেউ দেখলে পছন্দ করবে।

আমাকে নিয়ে গেলেই পারো।

আবার উলটোপালটা কথা বলছ। এখনো সময় হয়নি। আরো ধৈর্য ধরতে হবে।

আর কতদিন ধৈর্য ধরব? আমি তো একেবারে অস্থির হয়ে গেছি।

এতটা অস্থির হওয়া ভালো না। সম্পূর্ণ জীবনটা সামনে পড়ে আছে। যাইহোক, তাত্ত্বিক কথাবার্তা না বলি। আমি আসছি। তুমি চলে এসো।

ঠিক আছে। কোথায় অপেক্ষা করব?

টিএসসিতে, আমি এসে তোমাকে কল করব। রাখি।

কথা শেষ করে মোবাইল ফোনের গ্যালারি ওপেন করল নিদিয়া। শেষ ছবিটা রোমেলের। খুবই হ্যান্ডসাম দেখতে। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা আর ফরসা চেহারার রোমেলকে যে-কোনো মেয়ে পছন্দ করবে। তার সাথে ভার্সিটিতেই পরিচয় হয় রোমেলের। এক মাসের মাথায় কোনোরকম ভণিতা ছাড়া রোমেল সরাসরি বলে ভালোলাগার কথা। নিদিয়া প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করলেও রাজি হয়ে যায়। পরে বুঝতে পারে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। রোমেলের মতো ছেলে পাওয়া এ যুগে সত্যি কঠিন। খুবই কেয়ারিং সে। তার ফ্যামিলিও ভালো। বাবা মানিকগঞ্জের এক কলেজে জীববিজ্ঞানের প্রফেসর, মা গৃহিণী। দুই ভাইয়ের মধ্যে রোমেল বড়ো। ছোটো ভাই ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

নিদিয়া এবার এলো আয়নার সামনে। সে দেখতে সুন্দর, সত্যি সুন্দর। তার পেছনে যে ভার্সিটির কত ছেলে ঘুরছে সে নিজেও জানে না। তার সাথে রোমেলের সম্পর্কের কথা জানার পরও পিছু ছাড়েনি অনেকে। তবে এই প্রেম-ভালোবাসার বিষয়ে সে একেবারে স্পষ্ট। প্রোপোজাল নিয়ে নতুন কেউ এগিয়ে এলে ভদ্রভাবে প্রথমেই তাকে না করে দেয়। নিজের আচরণ এবং আবেগের ক্ষেত্রে সে সব সময় স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত থাকতে চায়।

বাড়িটা দেখে মুহূর্তের মধ্যে পছন্দ হয়ে গেল নিদিয়ার। গেট থেকে একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে বাড়ির মধ্যে। বাড়ির রং পুরোটাই লাল। দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে টাওয়ারের মতো একটা অবয়ব অনেক ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে, মাথার অংশটা মিনার আকৃতির। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় টাওয়ারে। ওঠার পথে ছোটো ছোটো জানালা আছে। একেবারে ওপরে গোল একটা অংশ রয়েছে, চারপাশটা উন্মুক্ত। সম্ভবত ওখানে বসার ব্যবস্থা আছে, ধারণা করল নিদিয়া।

কেয়ারটেকার হালিম আগে থেকেই গেটে অপেক্ষা করছিল। বয়স বিশ বছর। ব্যাগগুলো নিজেই ভেতরে নিয়ে এসেছে, রেখেছে বারান্দায়। বারান্দাটা বিশাল। নিদিয়া অবাক হয়ে বলল, বাবা, তুমি এই বাড়ি খুঁজে পেলে কীভাবে?

শাফায়েত আহমেদ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তোর পছন্দ হয়েছে?

দারুণ, কী বিশাল বারান্দা!

রুমগুলোও বড়ো বড়ো, দেখলে অবাক হবি। প্রত্যেক রুমের সাথে বারান্দা আছে।

তাই নাকি? এত সুন্দর দোতলা বাড়ি আমি আগে দেখিনি।

বাড়িটা দোতলা না, তিন তলা। মাটির নিচে এক তলা আছে, আর ওপরে দুই তলা। দোতলা থেকে সিঁড়ি টাওয়ারের ওপরের দিকে উঠে গেছে। টাওয়ারটা ভূমি থেকে একশো ফুট উঁচু, বলতে গেলে দশ তলার সমান। আমরা অবশ্য থাকব দোতলায়।

টাওয়ারে ওঠা যাবে না?

অবশ্যই। এই টাওয়ার আর ওপরে মিনারটাই এই বাড়ির মূল আকর্ষণ। অবশ্য সম্পূর্ণ বাড়িটাই সুন্দর। আমার বিশ্বাস কেউ এখানে একবার এলে আর সহজে যেতে চাইবে না।

আমারই তো আজীবন থেকে যেতে ইচ্ছে করছে।

আগে বলেছিলাম না তোকে।

চারদিকে তাকিয়ে নিদিয়া বলল, হ্যাঁ বাবা, সত্যি স্বীকার করছি বাড়িটা সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর।

চল ভেতরে যাই।

বাড়ির সামনে প্রথমেই একটা বরান্দা। বারান্দা দিয়ে ঢুকলে বিশাল ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুমের একপাশে বড়ো বড়ো দুটো কক্ষ। অন্যপাশে ডাইনিং আর রান্নাঘর। বারান্দার ডানপাশে একটা চওড়া রাজকীয় সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। দোতলায় সিঁড়ির মাথায় বেশ ফাঁকা একটা জায়গা। থাকার জন্য মোট চারটি কক্ষ আছে দোতলায়, ছোট্ট একটা ডাইনিংও আছে। দক্ষিণ পাশের পাশাপাশি দুটো কক্ষের একটিতে থাকবে নিদিয়া। তার পাশের কক্ষে থাকবে তার বাবা-মা।

নিদিয়া তার নিজের কক্ষে ঢুকে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। কক্ষটা অনেক বড়ো, কিং সাইজের খাটকে রুমের তুলনায় ছোটোই মনে হচ্ছে। একপাশে বড়ো আয়না, মেঝে থেকে একেবারে ছাদ পর্যন্ত। বাথরুমটাও বড়ো। সবচেয়ে সুন্দর লাগোয়া বারান্দাটা। এত বড়ো বারান্দা সে আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। বারান্দা থেকে ঘাটলা বাঁধানো বড়ো পুকুরটা দেখা যায়। বাড়ি আর পুকুরের মাঝে নানারকম ফুলের গাছ। মুগ্ধ হওয়ার মতো দৃশ্য। তার মনে হচ্ছে এখনই ছুটে যায় পেছনে। তার মা রুবিনার ডাকে অবশ্য সে বাস্তবে ফিরে এলো। খাওয়ার জন্য ডাকছেন তিনি।

নিদিয়া বাইরে বের হয়ে এলো। দোতলায় সিঁড়ির পাশের একটা কক্ষে ছোট্ট ডাইনিং। সেখানে এসে বসতে বাবুর্চি কুদ্দুছ ডাবের পানি এগিয়ে দিলো।

রুবিনা অবাক হয়ে বললেন, ডাবের পানি পেলে কোথায়?

এই বাড়িতে মেলা নারকেল গাছ আছে। ঐ গাছগুলো থাইকা পাইড়া রাখছি।

তাই নাকি?

হুঁ, আর ফলের গাছও অনেক। বেদেনা, জাম্বুরা, পেয়ারা সবই বাড়ির বাগানের।

গাছগুলো কোন দিকে?

এমন সময় ভেতরে প্রবেশ করলেন শাফায়েত আহমেদ। বললেন, পুরো বাড়ি ছড়িয়েছিটিয়ে আছে ফলের গাছে। তুই ঘুরলেই দেখতে পাবি। শুধু ফুল ফলের গাছ না, পুকুরে অনেক বড়ো মাছও আছে। পুকুর থেকে মাছ ধরে তোদের খাওয়াব।

এ তো দেখছি স্বপ্নের মতো।

এজন্যই তো বাড়িটা কিনেছি, তোদের ভালো লাগবে বলে। এই যুগে এইরকম বাড়ি পাওয়া সম্ভব না। সরকার সাধারণত এইরকম বাড়িগুলোকে হেরিটেজ প্রোপার্টি হিসেবে ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু এই বাড়িটাকে কেন করেনি বুঝলাম না। আমি...

মাঝখান থেকে নিদিয়া বলল, তুমি কিনবে বলে করেনি বাবা।

হয়তো তাই। চাইলেও এই বাড়ি পাওয়া যাবে না।

তুমি আবার অতিরিক্ত লাভ পেয়ে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ো না বাবা।

আরে না, তোর কি মাথা খারাপ? সময় পেলে তোদের সবাইকে নিয়ে মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকব। এরকম নিরিবিলি বাড়িতে থাকলে মন প্রফুল্ল হয়।

তুমি ঠিকই বলেছ।

কুদ্দুছ বাবুর্চির নাস্তা খেয়ে হাঁটতে বের হলো নিদিয়া। তার সাথে আছে কেয়ারটেকার হালিম। বারান্দা দিয়ে বাড়ির পেছনে এলো সে। হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ি কোথায়?

পাশের উপজেলায়।

তাহলে তো কাছেই। আগে এসেছ এই বাড়িতে?

না আসি নাই। চাকরি পাওয়ার পর আইছি।

পড়াশোনা কতদূর করেছ?

ক্লাস নাইন পর্যন্ত।

আহারে! এসএসসি পাশ করতে পারলে না?

বড়ো অভাব সংসারে আপা। নাইন পর্যন্ত পড়ছি তাই অনেক। এহন এই চাকরিডা পাইছি। সুযোগ পাইলে আরো পড়াশোনা করব।

বাড়িতে আর কে কে আছে?

মা আছে, আর আছে একটা বুইন। ক্লাস ফাইভে পড়ে।

বাবা কোথায়?

গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মইরা গেছে। আমার বয়স তখন বারো বছর। তারপর কষ্ট কইরা নাইন পর্যন্ত পড়ছি। আর পারি নাই। এহন ভালো আছি। চাকরিডা থাকলে কোনো চিন্তা নাই, চইলা যাবে।

কথা বলতে বলতে তারা পুকুরের পাড়ে এলো। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে পানির কাছে চলে এলো নিদিয়া। বিশাল পুকুর, তবে পানি কিছুটা কালো। দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। তারপরও নিদিয়া হাত দিয়ে নাড়া দিলো পানিতে। সাথে সাথে বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটল। ঠিক আট দশ হাত দূরে জোরে ছিটকে উঠল পানি। দেখে মনে হলো বুঝি বিশাল একটা কিছু নড়ে উঠল।

হালিম সাথে সাথে বলল, বড়ো কোনো মাছ মনে হইতেছে।

এ...এত বড়ো মাছ!

হবার পারে। মেল দিন এই পুকুরের মাছ কেউ ধরে না।

কেন?

আমি জানি না। তয় হুনছি বহুদিন আগে এই বাড়িতে একসাথে চাইরজন মানুষরে খুন করা হইছিল। ঐ খুনের রহস্য উদ্‌ঘটান হয় নাই। তারপর থাইকা বাড়িতে মানুষজন আসে না। কেউ কেউ বলে, ভূতের বাড়ি।

কী বলছ!

জি আপা, এমনই হুনছি।

নিদিয়া কেন যেন চুপ হয়ে গেল। যদিও সে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না, তারপরও তার কেন যেন ভয় ভয় করছে। ভরদুপুরে এরকম ভয় পাওয়া যে ঠিক না, বুঝতে পারছে সে। এজন্য ভয়টা প্রকাশ করল না। তবে আর না ঘোরার সিদ্ধান্ত নিল। ফিরে আসতে শুরু করল মূল বাড়ির দিকে।

কুলসুম খালার বয়স ষাট বছরের ওপরে। বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে সে। বিশাল বড়ো বাড়ি শুধু একা হালিমের পক্ষে দেখে রাখা সম্ভব নয়। এজন্য চাকরিটা পেয়েছে কুলসুম খালা। নিদিয়া লক্ষ করেছে কুলসুম খালা প্রায়ই একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকেলে দোতলার বারান্দায় বসে সে যখন ফেসবুকে একটা মেসেজ লিখছিল তখনো দেখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবাক হয়ে বলল, খালা, লক্ষ করছি প্রায়ই আপনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, কারণ কী?

খালা টেবিল মুছছিল। মাথা উঁচু করে বলল, আপনের চেহারা বড়ো সুন্দর, আপা।

আমি সুন্দর!

হঁ, মেলা সুন্দর। এমন সুন্দর আছিল আরেকজন। এক্কেবারে আপনের মতো দুধে আলতা রঙ। আম তারে আপনের চেহারার মইধ্যে খুঁইজা পাই। তাই বারবার তাকাই।

কে ছিল সে?

লায়লা আপা।

লায়লা আপা কে?

খন্দকারের বউ।

আপনি যাদের কথা বলছেন তাদের কাউকেই আমি চিনি না।

কুলসুম খালা এগিয়ে এসে বলল, এই বাড়ির মালিক আছিল খন্দকার। তার পুরা নাম ইয়াকুব খন্দকার। কেউ কেউ তারে খন্দকার সাহেব ডাকত। তয় গ্রামের সবাই ডাকত খন্দকার বইলা। আসলে হে গরিব আছিল। কেমনে কেমনে অল্পবয়সে মেলা টাকার মালিক হইয়া যায়। ঐ সময় খালি ইয়াকুব নামডা পছন্দ হইত না। নামের পরে খন্দকার লাগাইছিল। আর এই বাড়ির নামও রাখছিল খন্দকার বাড়ি। তার স্ত্রীর নাম আছিল লায়লা। বয়স কম আছিল। আপনের মতোই

হবে, দেখতেও আপনের মতো সুন্দর আছিল।

তারা কোথায়?

এক রাইতে সবাই খুন হইছে। কারা খুন করছে বাইর করবার পারে নাই পুলিশ। ঐ রাইতে চাইরজন খুন হইছিল।

কী ভয়ংকর কথা!

জি আপা। আপনের চেহারা হুবহু লায়লা আপার মতো। তাই চাইয়া থাকি আপনের দিকে। দুইজন মানুষের চেহারায় এত মিল হয় কেমনে? গলায় আপনের যে ছোট্ট তিল আছে, লায়লা আপার গলায়ও ঐরকম তিল আছিল।

হতে পারে, দুজন মানুষের চেহারায় মিল থাকতেই পারে। পৃথিবীতে অনেক মানুষের চেহারা অন্য মানুষের মতো।

আপনের চেহারা আর লায়লা আপার চেহারা এক্কেবারে মিলা গেছে। কোনো পার্থক্য নাই। চেহারার এমন মিলওয়ালা মানুষ আমি আগে দেখি নাই।

এখন না হয় দেখলেন খালা। যাইহোক, খন্দকার সাহেবের মৃত্যুর পর এই বাড়িতে কে থাকত?

কেউ থাকত না।

কেন?

তার বাড়িতে অন্য কেউ থাকবে ক্যান? পুলিশ মেলা দিন বাড়িডা সিল কইরা রাখছিল। তারপর অনেকে কিনবার আইছে। কিন্তু কেউ কিনে নাই। আপনেরাই প্রথম কিনলেন আর এহন থাকবার আইছেন।

খন্দকার সাহেবের আত্মীয়স্বজনেরা কোথায়?

তার কেউ আছিল না। ইউনিয়ন এতিমখানায় বড়ো হইছিল। তার জন্ম কোথায় কেউ বলবার পারে না। হে নিজেও জানত না। কলেজে পড়াশোনা শ্যাষ কইরা উপজেলায় কাঁচামাল আর মাছের ব্যবসা করত। এই এলাকা থাইকা কিনা ঢাকায় নিয়া বিক্রি করত। পরে তিনডা ইটভাটা দিছিল। দশ বছরে মেলা টাকার মালিক হয় সে। এই জমি কিনা বাড়িও করে। অবশ্য তহন বয়স একটু বেশি আছিল। চল্লিশের কাছাকাছি। ঐ সময় বিয়া করে। বউ নিয়া ওঠে এই বাড়িতেই। বউয়ের সাথে তার বয়সের পার্থক্য আছিল বেশি। বিশ বছরের মতো। কড়া শাসনে রাখত লায়লা আপারে। আমি দেখছি।

আসলে ইয়াকুব খন্দকারের ব্যবহার ভালো আছিল না। অল্পবয়সে টাকাপয়সা হইলে যা হয়।

বাড়িটা কিন্তু সুন্দর বানিয়েছে।

হাঁ, ব্যবসার মাঝখানে ভারত গেছিল। এইরকম একটা বাড়ি কোথায় যেন দেখছিল সে। তারপর আইসা বাড়িডা বানায়। পাঁচ বছর লাগছিল।

আপনি দেখি অনেককিছু জানেন।

এই গ্রামে আমি বড়ো হইছি। জানব না ক্যান? গ্রামের সবাই জানে। আসলে তাগো জীবন নিয়ে বহু কাহিনি আছে।

কী কাহিনি?

কাহিনি শুনতে আপনের ভালো লাগবে কি না জানি না। তয়...

এমন সময় ডাক দিলেন রুবিনা, নিদিয়া, তুই কোথায়? নাস্তা করতে আয়।

নিদিয়া দেখল তার মা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসেছে। সে কিছু বলার আগে আবার বলল, কখন থেকে তোকে ডাকছি। শুনতে পাচ্ছিস না। আয় নিচে আয়, নাস্তা করবি।

ক্ষুধা নেই মা। শুধু একটা চা দাও, আদার চা।

তোর বাবা তোর জন্য অপেক্ষা করছে। আর খালা, আপনার কাজ শেষ হয়নি? এতক্ষণ কী করছেন ওপরে?

তাড়াতাড়ি নিদিয়া বলল, আমিই গল্প করছিলাম খালার সাথে। খালাকে কিছু বোলো না। বেচারা বয়স্ক মানুষ। এই বয়সে কাজ করে খাচ্ছে তাই কত। গ্রাম সম্পর্কে সে অনেক কিছু জানে। সুন্দর সুন্দর গল্পও আছে এই গ্রামের। তাই খালাকে বলছিলাম গল্পগুলো বলতে। আর এই বাড়ির পূর্ব ইতিহাস শুনছিলাম। ভালোই লাগছিল।

পরে শুনবি, এখন নাস্তা করবি, আয়। আদার চা কথা বলে দিচ্ছি।

চলো যাই।

নাস্তা শেষ করতে বেশ সময় লেগে গেল। অতঃপর ছাদে এলো নিদিয়া। সাথে তার বাবা শাফায়েত আহমেদ আছে। হালিম আগেই এসেছিল। উদ্দেশ্য টাওয়ারে ওঠা। ওপরের দিকে তাকিয়ে শাফায়েত আহমেদ বললেন, উঠতে পারবি নিদিয়া?

পারব বাবা।

ধীরে ধীরে উঠতে হবে।

মা আসবে না?

না। প্রেশার একটু বেড়েছে। আমিই নিষেধ করেছি। অহেতুক ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী?

তা ঠিক বলেছ। চলো।

সবার আগে থাকল হালিম, তারপর নিদিয়া আর একেবারে পেছনে শাফায়েত আহমেদ। সিঁড়িটা প্যাঁচানো। এজন্য ওপরে ওঠার সময় মনে হয় মাথা ঘুরছে। অর্ধেকটা ওঠার পর বিশ্রামের জায়গা আছে। বিশ্রামের এই জায়গাটা সাত তলার সমান উঁচু হবে। কারণ দেওয়ালে লেখা আছে সত্তর ফিট। মিনিট তিনেক বিশ্রাম নিয়ে আবার তারা উঠতে শুরু করল। এক সময় এসে পৌঁছাল ওপরে। জায়গাটা গোলাকার, ব্যাস বারো ফুট হবে। একপাশে লেখা, উচ্চতা একশো ফুট।

শাফায়েত আহমেদ বললেন, দেখে মনে হয় খুব বেশি উঁচু না, আসলে অনেক উঁচু। একশো ফুট, মানে দশ তলার সমান।

তুমি ঠিকই বলেছ বাবা, আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠার অভ্যাস তো তোমার আমার নেই। লিফটে উঠতে উঠতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এজন্য কষ্ট বেশি হয়েছে।

ঠিকই বলেছিস।

এবার হালিম বলল, স্যার পানি দিব। সাথে কইরা নিয়া আনছি।

দাও, একটু খাই।

শাফায়েত আহমেদ দুই ঢোক পানি খেলেন। তারপর বলেন, চারপাশটা কী সুন্দর, তাই না?

নিদিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, পুরো গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ঐ যে দূরে একটা নদী, ওপাশে ফসলের খেত। জোছনা রাতে এখান থেকে প্রকৃতি দেখার মজাই হবে অন্যরকম।

তুই ঠিকই বলেছিস।

ঐ যে পুকুরের ওপাশে একটা টিলা। টিলার ওপরে একটা টিনের ঘর আছে। ঘরের চারপাশে কোনো বেড়া নেই, মাঝে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার আছে। ঘরের চালটা লাল। দেখতে পাচ্ছ বাবা?

হ্যাঁ, ঐ টিলার নাম লাল টিলা। আর ঐ ঘরটার নাম লাল ঘর। বাড়ির মালিক ইয়াকুব খন্দকার নাকি মাঝে মাঝে ওখানে বসতো। আমি ঘরের ওপরের টিনটা নতুন করে লাগিয়েছি যেন দেখতে সুন্দর লাগে। সুন্দর না?

হ্যাঁ বাবা।

এমন সময় আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। শাফায়েত আহমেদ বললেন, চল নামি, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

এখনই নামবে।

হ্যাঁ। পরে এক সময় এখানে সবাই মিলে নাস্তা করব।

পূর্ণিমার রাত হলে ভালো হবে।

তুই ঠিকই বলেছিস।

বারবিকিউ করবে নাকি?

এত ওপরে করব কীভাবে? জিনিসপত্র নেই গ্রামে। তবে পরেরবার যখন আসব তখন ব্যবস্থা করব।

নাহিয়ান থাকলে খুব ভালো হতো।

ঠিকই বলেছিস! খুব পছন্দ করত। তুই এক কাজ কর, কিছু ছবি তুলে অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দে। নাহিয়ান দেখলে খুশি হবে। আর ওর সাথে কথা বলিস তো।

প্রত্যেকদিন বাবা।

কথা বলবি। ভাইবোনের মধ্যে ভালো মিল থাকতে হবে। তুই বড়ো, তোর দায়িত্ব বেশি। চল যাই, আজান শেষ হয়ে গেছে।

নামার আগে কয়েকটি ছবি তুলল নিদিয়া। তারপর তাকাল নিচে। পুকুরটাকে এখান থেকে দেখা যায়। হঠাৎ তার মনে হলো আধো অন্ধকারে পুকুরঘাটে কাউকে দেখল সে। তার দিকেই যেন তাকিয়ে ছিল। একজন মধ্যবয়সি পুরুষ। দুই সেকেন্ডের মাথায় হারিয়ে গেল বড়ো গাছের আড়ালে।

মাথা ঝাঁকি দিয়ে আবার খোঁজার চেষ্টা করল পুরুষটিকে। না দেখতে পেল না। নিদিয়া ভাবল সম্পূর্ণ বিষয়টা ছিল দৃষ্টিভ্রম। এত ওপর থেকে আধো অন্ধকারে তার একজন মানুষের চেহারা দেখতে পাওয়ার কথা না। অথচ সে দেখেছে। এটা দৃষ্টিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

সারাদিনের ব্যস্ততার কারণে সবাই ক্লান্ত। এজন্য রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ল সবাই। নিদিয়াও শুয়ে পড়েছে তার কক্ষে। কিন্তু কেন যেন তার ঘুম আসছে না। খানিকটা গরম লাগছে। এজন্য জানালা খুলে দিলো। জানালার ওপাশে বারান্দা। বারান্দায় যেতে হলে একটা দরজা দিয়ে যেতে হয়। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখা আছে।

বাইরের দৃশ্যটা চোখে পড়তে মন ভরে গেল নিদিয়ার। চাঁদ দেখা যাচ্ছে। পূর্ণিমা না হলেও পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়টা। জোছনার উজ্জ্বলতায় অপূর্ব লাগছে পুকুরটাকে। হালকা বাতাস থাকায় ঘরের ভেতরটাও ঠান্ডা হয়ে আসতে শুরু করেছে। সবকিছু মিলিয়ে দারুণ একটা অনুভূতি। এরকম ভালোলাগার মধ্যে নিদিয়া ঠিক করল ফোন করবে রোমেলকে। ওপাশে রিং হচ্ছে না। সম্ভবত চার্জ নেই, অনুমান করল নিদিয়া। মনটা তার কিছুটা খারাপ হয়ে গেল।

খাটের একপাশে বোতলে পানি রাখা আছে। গ্লাসে পানি ঢেলে খানিকটা পানি খেলো সে। একটা বই এনেছিল সাথে। বই পড়লে তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসে। কিন্তু বইটা খুঁজে পাচ্ছে না। ব্যাগের মধ্যে কোথায় যে রেখেছে মনে করতে পারছে না।

নিদিয়া হেঁটে এবার আয়নার সামনে এলো। আয়নাটা অনেক বড়ো। একেবারে পা পর্যন্ত দেখা যায়। আয়নাটা জানালার ঠিক উলটো পাশে। এজন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালে পেছনের জানালাটা দেখা যায়। নিদিয়া চিরুনি হাতে নিয়ে চুল আঁচড়াতে শুরু করল। রাতে ঘুমানোর আগে সুযোগ পেলে সে চুল আঁচড়ায়। এতে চুলের গোড়ায় রক্তপ্রবাহ বাড়ে এবং গোড়া শক্ত হয়। তাছাড়া চুল আঁচড়াতে তার ভালো লাগে।

আয়নার মধ্যে হঠাৎ নিদিয়ার চোখ পড়ল জানালার ওপর। আর তাতে চমকে উঠল সে। একজন মধ্যবয়সি পুরুষ জানালার গ্রিল ধরে

তার দিকে তাকিয়ে আছে। এতটাই চমকে উঠল যে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। আবার ঘুরে আয়নায় তাকাল। না কেউ নেই। আয়নার মধ্যে কিংবা বারান্দায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু জানালার পর্দা উড়ছে। বারান্দায় কারো আসার উপায় নেই। বারান্দা থেকে ছাদ পর্যন্ত গ্রিল দিয়ে আটকানো। আবার এদিক থেকে দরজা বন্ধ। সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই কারো পক্ষে বারান্দায় যাওয়া সম্ভব না। আর কাকে সে দেখেছে ঠিক মনেও করতে পারছে না। শুধু এটুকু মনে করতে পারছে মানুষটা ছিল একজন পুরুষ যার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

আবারও খানিকটা পানি খেলো নিদিয়া। তারপর তাকাল বারান্দার দিকে। না কেউ নেই। থাকাও সম্ভব না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যে দৃষ্টিভ্রম অনুমান করল সে। কিন্তু এই দৃষ্টিভ্রমটা আজ তার বারবার হচ্ছে। সন্ধ্যায় একবার হয়েছে, আবার এখন। এটা ভালো লক্ষণ না। মানুষ যখন অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে কিংবা শারীরিক দুর্বলতা থাকে তখন দৃষ্টিভ্রম বেশি হয়। এই দুটোর কোনোটাই তার মধ্যে নেই। তাহলে কেন দুবার তার দৃষ্টিভ্রম হলো? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেও পেল না সে।

হঠাৎ তার মনে হতে লাগল এই দুইবারে সে যে দুজনকে দেখেছে তাদের চেহারা একই। অর্থাৎ একজনকেই দেখেছে সে। কীভাবে সম্ভব? আর কাকেই বা দেখেছে? নাম কী তার? কেনই বা দেখবে? এই প্রশ্নগুলো কিছুটা হলেও তার মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করল। কিছুটা ভয় ভয়ও করছে। ভয় কমাতে শেষে টেনে দিলো জানালার পর্দা। এখন আর বাইরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘরে এসি আছে। তার ইচ্ছে ছিল এসি চালাবে না। কিন্তু গরম লাগায় চালু করল এসি। হালকা একটা শব্দ হচ্ছে এসিতে। কানে লাগলেও এখন তার কিছু করার নেই। ঘুম আস্‌লে হয়, এক ঘুমে রাত পার করে দেবে। এরকম ভাবনা থেকে শুয়ে পড়ল। পায়ের কাছের চাদর টেনে দিলো মাথা পর্যন্ত । তারপর উলটোভাবে একশো থেকে এক পর্যন্ত গুনতে শুরু করল।

কতক্ষণ নিদিয়া এভাবে ছিল বলতে পারবে না। হঠাৎ অনুভব করল কেউ একজন তার কক্ষে আছে। সে চোখ মেলতে চেষ্টা করল,

কিন্তু পারল না। চোখের পাতা ভারী মনে হচ্ছে। আদৌ সে জেগে আছে নাকি ঘুমিয়ে আছে বুঝতে পারছে না। তবে কেউ যে তার কক্ষে আছে এই ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ভেতরে হাঁটার শব্দ হচ্ছে এখন। কে হতে পারে? তার ঘরে আসার কোনো উপায় নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তাহলে রাতে কি ভেতরে কেউ ছিল? তা কীভাবে সম্ভব? এই বাড়িতে রাতে শুধু হালিম আছে। তার থাকার ঘর নিচে, সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে? এরকম ভেবেও উত্তর খুঁজে পেল না সে।

এরকম যখন ভাবছে নিদিয়া, তখন আরো ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল। ভেতরে যে ছিল সে একেবারে এসে বসল তার মাথার পাশে। মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ছে। নিদিয়া ভাবল সে চিৎকার দেবে। কিন্তু পারল না। শক্ত একটা হাত এসে পড়ল তার মুখের ওপর। সাথে সাথে চমকে উঠল সে। নিশ্চিত সে স্বপ্ন দেখছে না, কারণ মুখের ওপর চাপ অনুভব করছে। নিজের হাত দিয়ে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল মুখের ওপরের হাতটা। কিন্তু পারল না। প্রচণ্ড শক্তি অজানা মানুষটির হাতে। সে যখন হাত-পা ছুড়ে ছটফট করছে, তখনই কানের কাছে বলতে শুনল, মোটেও নড়াচড়া করবা না, আমি যা বলতেছি খালি শুনবা।

একেবারে জমে গেল, নিদিয়া। বুঝতে পারছে, খাটের ওপরে পুরুষটি অচেনা এবং তার উদ্দেশ্য ভালো নয়। চেষ্টা করেও সে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ তার মুখটা চাদরে ঢাকা। ঘুমের আগে নিজেই চাদর টেনে নিয়েছিল মুখের ওপর।

নিদিয়া আবার নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। পারল না। উলটো পুরুষের হাতটা আরো শক্তভাবে চেপে বসল তার মুখের ওপর। মনে হচ্ছে চোয়াল বুঝি ভেঙে যাবে। পুরুষটি বলছে, তুমি অহেতুক ছটফট করতেছ। কোনো লাভ নাই। আমার সাথে পারবা না। বরং মঙ্গল চাইলে আমি যা বলি তা শুনবা। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। শুধু একটাই কথা আমার, আমি তোমারে চাই। কারণ তোমারে আমি ভালোবাইসা ফেলাইছি নিদিয়া।

নিদিয়া কী বলবে বুঝতে পারছে না।

পুরুষটি বলে চলছে, তুমি দেখতে হুবহু আমার স্ত্রীর মতো। আমার স্ত্রীরে আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু সে মৃত। মৃত মানুষরে ভালোবাসলেও তারে পাওয়া যায় না। আমি তোমারে ভালোবাসবার চাই, তোমারে পাইতে চাই। তুমি কি আমার কথা শুনবার পাইতেছ?

স্থির হয়ে থাকল নিদিয়া, কোনো কথা বলল না। তার খুব ভয় করছে ।

পুরুষটি বলে চলছে, এই বাড়ি আমার, এইখানেই আমি থাকি। আমি চাই, তুমি আমার সাথে এই বাড়িতে থাকবা। আশা করতেছি তোমারে নিয়া আমি সুখী হবার পারব। আমার কোনো অভাব নাই, শুধু ভালোবাসা ছাড়া। সেই ভালোবাসা আমি তোমার কাছ থাইকা চাই। তুমি হবা আমার শুধুই আমার। আমার কথা কি বুঝতে পারতেছ?

নিদিয়া কোনো উত্তর দিলো না।

আমার সাথে তোমার কথা বলতে হবে, আমারে তোমার ভালোবাসতে হবে। তুমি হয়তো ভাবতেছ আমি কে? আমারে তুমি দ্যাখছো। সন্ধ্যায় দ্যাখছো পুকুরের পাড়ে, রাইতে দ্যাখছো আয়নার ভেতরে। আমি আছি, তোমার পাশেই আছি, তোমার জন্য আছি। তুমি ভয় পাবা না, মোটেও না। শুধু আমার কথামতো চলবা, আমারে ভালোবাসবা, এই হইতেছে তোমার কাজ। আমি তোমার জীবন সুখ আর আনন্দ দিয়া ভরায় দিব। তুমি আমি হবো সুখী, চিরসুখী।

একটু থামল পুরুষটি। তারপর আবার বলতে শুরু করল, এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝবার পারছ আমি কে? আমি ইয়াকুব খন্দকার, এই বাড়ির মালিক। সবাই ডাকে খন্দকার বইলা। তুমি আমার স্ত্রীর মর্যাদা নিয়া এই বাড়িতে থাকবা। এইখানকার সবকিছু তোমার। বিনিময়ে তুমি শুধু আমার, শুধুই আমার। একটা কথা মনে রাখবা, কোনো সময় আমার কথার অবাধ্য হবা না। অবাধ্য কাউরে আমি পছন্দ করি না। আমার আগের স্ত্রী আমার সাথে প্রতারণা করছিল, আমার অবাধ্য হইছিল, এইজন্য তারে কঠিন পরিণতি বরণ করতে হইছে। আমি দেখবার চাই না, তুমি ঐরকম কিছু করছ। সব সময় আমার অনুগত থাকবা। আমি যা বলব সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করবা। তাইলেই শান্তি পাইবা। ঠিক আছে?

নিদিয়া অনুভব করল তার মুখের ওপরের চাপ কমে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে তার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এখন শ্বাস নিতে পারছে।

পুরুষটি আবার জিজ্ঞেস করল, কথা বলতেছ না কেন?

নিদিয়া ওপরে-নিচে মাথা দোলাল।

এই তো লক্ষ্মী স্ত্রী আমার! এইরকমই চাই। আমি জানি স্ত্রী হিসেবে তুমি বড়ো ভালো হবা। এখন ঘুমাও। আইজ আর আমি তোমারে বিরক্ত করব না।

কথা শেষ হতে-না-হতেই নিদিয়া অনুভব করল খন্দকার নামের পুরুষটি চাদরের ওপর দিয়ে তার ঠোঁটে একটা চুমু খেলো। জীবনে কোনো পুরুষ তাকে চুমু খায়নি, এমনকি রোমেলও নয়। তাই ব্যাপরটা সে সহ্য করতে পারল না। দুহাতে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো ইয়াকুব খন্দকার নামের পুরুষটিকে। তারপর দ্রুত মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসল। তার মনে হলো আলোর মধ্যে একটা কেউ বুঝি মিলিয়ে গেল। চেহারাটা যেন সে অস্পষ্ট দেখতেও পেল। তবে ঠিক কেমন ছিল মনে করতে পারল না।

ডানপাশে খুট শব্দ হতে নিদিয়া দেখল মাথার পেছনের জানালাটা খোলা। কীভাবে খুলল ঠিক বুঝতে পারছে না। একটা কিছু যে ঘটেছে নিশ্চিত সে। তার শরীর ভয়ে কাঁপছে। পানি পিপাসাও পেয়েছে। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি খেলো সে। তারপর উঠে এলো দরজার কাছে। ভাবল, তার বাবা মাকে ডেকে তুলবে। পরক্ষণেই বাদ দিলো চিন্তাটা। সে যা বলবে তার কোনোকিছুরই প্রমাণ নেই তার কাছে।

জানালার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে জানালাটা আবার বন্ধ করল নিদিয়া। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। ভয় করলেও অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণেই হয়তো দ্রুত ঘুমিয়ে গেল সে।

সকালে নাস্তা শেষ করে নিদিয়া চা নিল। তার বাবা শাফায়েত আহমেদ বাইরের বারান্দায় চলে গেছেন। কয়েকজন ক্লায়েন্ট এসেছে। পুরাতন জিনিসপত্র কিনবে। তাদের সাথে কথা বলবেন তিনি।

রুবিনা আর নিদিয়া বসে আছে ডাইনিং টেবিলে। নিদিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, মা, তোমার ঘুম হয়েছিল?

রুবিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হুঁ, এক ঘুমে রাত পার, টেরই পাইনি।

আমার কিন্তু ঘুম হয়নি?

কেন?

নিদিয়া একটু সময় নিয়ে বলল, আমার কী মনে হয় জানো?

কী মনে হয়?

এই বাড়িতে এমন কেউ আছে যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

রুবিনা এবার সরাসরি তাকালেন নিদিয়ার দিকে। তারপর বললেন, কে থাকবে? আর থাকলে দেখতে পাব না কেন?

আমি ঠিক জানি না মা। আমার মনে হয়েছে গতরাতে কেউ একজন আমার ঘরে ঢুকেছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ থেকে চলে গেছে।

কী বলছিস!

হ্যাঁ মা। প্রথমে মনে হয়েছিল স্বপ্ন, পরে বুঝতে পেরেছি সত্যতা আছে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম মা। একবার ভাবছিলাম তোমাদের ডাকব। পরে আর ডাকিনি। সত্যি কথা বলতে কী, আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। চলো, চলে যাই।

বাড়িটাই তো দেখতে পারলাম না। যাব কীভাবে?

পরে অন্য এক সময় এসে না হয় দেখব।

এটা কেমন কথা! আমার মনে হয় তুই স্বপ্নই দেখেছিস আর অহেতুক ভয় পাচ্ছিস। তারপরও তোর বাবার সাথে কথা বলে দেখি। তোর বাবা যদি যেতে চায়, চলে যাব।

আমি বাবাকে বলব।

ঠিক আছে বলো।

নাস্তা খাওয়া শেষ হলে নিচের বারান্দায় এলো নিদিয়া। তার বাবা-সহ অন্যরা আন্ডারগ্রাউন্ডে যে ফ্লোর আছে সেখানে গেছে। সে-ও আন্ডারগ্রাউন্ডে এলো। ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। নিদিয়াকে দেখে শাফায়েত আহমেদ বললেন, এখানে এসেছিস ভালোই হয়েছে। পুরাতন অনেক আসবাবপত্র ছিল এই বাড়িতে, এই যে দ্যাখ। পাশাপাশি দুটো কক্ষতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। বিক্রি করে দিচ্ছি।

এগুলো বিক্রি করে আর কত টাকা পাবে?

রেখেও লাভ নেই। নষ্ট হবে।

নিদিয়া দেখল নিচে একটা বিশাল ড্রয়িংরুমের মতো জায়গা রয়েছে। দুপাশে দুটো করে চারটি কক্ষ। দক্ষিণপাশের কক্ষ দুটোতে মালপত্র ভরতি। একটি কক্ষে টেবিল, চেয়ার, খাট, সোফা এই ধরনের জিনিসপত্র। অন্যটিতে কার্টুনের মধ্যে জামাকাপড়, পরিধেয় বস্ত্র বেশি। হালিম কার্টুনগুলো খুলে খুলে দেখাচ্ছে। জামাকাপড়গুলোর দিকে আগ্রহ নেই ক্রেতাদের। তাদের চেয়ার, টেবিল, খাট, শোপিস এগুলোর প্রতি আগ্রহ বেশি।

বড়ো একটা কার্টুনে ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি পেল হালিম। ছবিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো শাফায়েত আহমেদের কাছে। ছবিটা দেখে বেশ অবাক হলেন শাফায়েত আহমেদ। দুই ফুট বাই দেড় ফুট ফ্রেমে এক নারীর ছবি। চেহারা হুবহু নিদিয়ার মতো। নিদিয়া নিজেও অবাক হলো ছবিটা দেখে। বলল, এ তো দেখছি আমার চেহারা!

হ্যাঁ। গলায় একটা তিল পর্যন্ত আছে। কে এই মেয়েটা?

হালিম মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না।

বড়ো অদ্ভুত লাগছে বিষয়টা। কাকতালীয়ও বটে।

নিদিয়া এবার বিড়বিড় করে বলল, বাবা, আমার ভালো লাগছে না।

কেন?

মনে হচ্ছে এটা একটা ভূতুড়ে বাড়ি।

কী বলছিস!

তা না হলে এরকম হবে কেন? আমার ছবি এখানে থাকবে কেন? কেমন যেন ভয় করছে।

পৃথিবীতে অবাক করা অনেককিছুই ঘটে। এই ঘটনাটাও হয়তো সেরকম। দুজন মানুষের চেহারায় মিল থাকতেই পারে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

চলো ওপরে যাই।

তুই যা। আমি দেখে যাই, আর কী আছে?

শাফায়েত আহমেদ কার্টুনগুলো আবার দেখতে শুরু করলেন। ছবিটা তার হাতেই রয়েছে। নিদিয়া হেঁটে অন্য পাশে এলো। এপাশে দুটো কক্ষ। প্রথম কক্ষটা ফাঁকা। কিছু নেই ভেতরে। কক্ষগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জানালা পর্যন্ত নেই। কেমন যেন একটা গুমোট গুমোট গন্ধ। কোনো কক্ষে দীর্ঘদিন মানুষের যাওয়া-আসা না থাকলে এমনই গন্ধ হয়। পাশের কক্ষে প্রবেশ করে অবশ্য গন্ধটা সে পেল না। তবে কেমন যেন একটা শোঁ শোঁ শব্দ কানে এলো তার। শব্দটা খুব হালকা, তবে কানে লাগে। কিন্তু কোথা থেকে আসছে ঠিক বুঝতে পারছে না।

নিদিয়া যখন ঘুরে দাঁড়াল, তখনই চলে গেল ইলেকট্রিসিটি। মুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশটা। নিদিয়া বের হতে গিয়েও পারল না। হঠাৎই কেউ একজন পেছন থেকে তার মুখ চেপে ধরল। নিদিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেও পারল না, ভয়ংকর শক্তি মানুষটার শরীরে। সে টুঁ-টাঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারছে না।

এদিকে শাফায়েত আহমেদ দুবার ডাক দিলেন, নিদিয়া, নিদিয়া।

কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পাশে দাঁড়ানো হালিম বলল, স্যার মনে হয়, ওপরে চলে গেছে।

তাহলে চলো, আমরাও যাই।

দুইজন ক্রেতা-সহ সবাই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

নিদিয়া ছটফট করছে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু পারছে না। অসুরের শক্তি যেন মানুষটার শরীরে। ধীরে ধীরে হাত আরো শক্তভাবে চেপে বসছে তার মুখের ওপর।

হঠাৎই সে ফিসফিস করে বলতে শুনল, ছটফট করবা না নিদিয়া। আমি ইয়াকুব খন্দকার। মনে আছে, গতরাইতে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। ভয় পাবা না। আমার কথা শুনলে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।

নিদিয়া একেবারে চুপসে গেল।

খন্দকার বলতে থাকল, আমার স্ত্রীর ছবি তুমি দ্যাখছ। হুবহু তোমার মতো। সত্য কথা বলতে কী, আমি তোমার মাঝে আমার স্ত্রীরে খুঁইজা পাইছি। বড়ো ভালোবাসতাম তারে। তোমারেও ভালোবাসতে শুরু করছি। এইজন্য আমি তোমারে চাই, মনের মতো কইরা চাই। তুমি থাকবা, এই বাড়িতে থাকবা, ঠিক আমার মনের মতো কইরা। আর আমি যে সত্য, আমার যে অস্তিত্ব আছে, নিশ্চয় বুঝবার পারছ। নিশ্চিত না হইলে যে কক্ষে আমার স্ত্রীর ছবি দেখছ ঐ একই কক্ষের শেষ কার্টুনটাতে আমার একটা ছবি আছে, দেখবার পারো। আমি বলবার পারি, আমারে তোমার ভালো লাগবে, বড়ো ভালো লাগবে।

কথাগুলো শেষ হতেই জেনারেটর চালু হলো। ইলেকট্রিসিটির আলোতে ভরে উঠল চারপাশটা। নিদিয়া অনুভব করল সে মুক্ত, কেউ নেই। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

আর দাঁড়াল না নিদিয়া। দৌড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

নিজের কক্ষে এসে হাঁপাতে লাগল নিদিয়া। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সত্যি তার খুব ভয় করছে। ভয় কাটাতে হলে কাউকে পাশে দরকার। এ মুহূর্তে কাকে কাছে পাবে? তার বাবা ব্যস্ত। মা তার কথা বিশ্বাস করছে না। বিশ্বাস করানোর মতো প্রমাণ তার কাছে নেই। অবশ্য একটা প্রমাণ আছে। আর তা হলো ভূগর্ভস্থ কক্ষে পাওয়া একটি ছবি। কিন্তু ছবিটা কোথায়? ঠিক মনে করতে পারছে না সে।

খন্দকার নামের মানুষটি তার নিজের ছবির কথাও বলেছে। ছবি নিচে আছে। যদি পাওয়া য়ায় তাহলে বুঝতে হবে আসলেই খন্দকার মানুষটির অশরীরীয় অস্তিত্ব আছে। আর যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সবকিছু যে ছিল অডিটরি (Auditory) হ্যালুসিনেশন, নিশ্চিত হবে সে। তাই ডাক দিলো হালিমকে। হালিম এলে বলল, তুমি নিচে যাবে। যে কক্ষে আমার মতো দেখতে একটি মেয়ের ছবি পাওয়া গেছে, সেই কক্ষের শেষ কার্টুনটাতে আরেকটা ছবি আছে, পারলে নিয়ে আসবে।

ঠিক আছে আপা। আর কিছু আনা লাগবে?

না, শুধু ছবিটা দরকার।

আইচ্ছা আপা।

হালিম চলে গেলে নিদিয়া এক গ্লাস পানি খেলো। ঠিক তখনই ফোন এলো রোমেলের। ফোন পেয়ে সে বলল, কী খবর তোমার? রাতে ফোন বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?

রোমেল বলল, আর বোলো না, চার্জ চলে গিয়েছিল।

একটু খবরও নিবে না।

আমি দুঃখিত। আসলে খুব পরিশ্রান্ত ছিলাম কাল। লম্বা একটা ঘুম দিয়েছি, উঠেছি কখন জানো, এগারোটায়। নাস্তা করে তোমাকে ফোন করলাম। বলো কেমন আছো?

ভালো নেই।

কেন?

পুরাতন বাড়ি, কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

ভয় করবে কেন? সবাই আছে না?

আছে, তারপরও কীসের যেন ভয়। তোমাকে কীভাবে যে বলি?

আমাকে না বললে কাকে বলবে?

নিদিয়া একটু সময় নিল। তারপর বলল, এই বাড়িতে অশরীরীয় একটা কিছু আছে।

কীসের কথা বলছ তুমি? ভূতপ্রেত।

হ্যাঁ, ঐরকমই কিছু।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তুমি শিক্ষিত মেয়ে। ভূতপ্রেত বিশ্বাস করবে কেন? এগুলো পুরান দিনের মানুষের কল্পনা। আর সিনেমায় দেখা আজগুবি ঘটনা। যাইহোক, হঠাৎ তোমার ঐরকম মনে হচ্ছে কেন?

আ...আসলে আসলে... কী হয়েছে জানো? এই বাড়িতে আমার মতো দেখতে একটা মেয়ের ছবি পাওয়া গেছে। তাকে অনেক আগে হত্যা করা হয়েছিল। সে ছিল ইয়াকুব খন্দকার নামের এক ব্যক্তির স্ত্রী। ঐ খন্দকারকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, খন্দকার এই বাড়ির মধ্যে হাঁটাচলা করে, আর...আর...

আর কী?

আমার দিকে নজর দিয়েছে।

রোমেল হো-হো করে হেসে উঠে বলল, তা তো দিবেই। কারণ তুমি অসাধারণ সুন্দরী। তোমার মতো সুন্দরী কতজন আছে বাংলাদেশে। আর ভার্সিটিতে তো তুমি একজনই। তোমার মতো চোখধাঁধানো সুন্দরী পেয়ে ইয়াকুব খন্দকার মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। যেখানে আমিই তোমার পিছু ছাড়ছি না, খন্দকারের দোষ কোথায়?

ফাজলামো কোরো না। বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে নাও।

রোমেল টেনে টেনে বলল, আমি অতীব গুরুত্বের সাথে নিয়েছি। এতটাই গুরুত্ব যে তুমি চাইলে এখনই আমি চলে আসতে পারি। তারপর খন্দকার ব্যাটাকে ধরে এমন ধোলাই দেবো যে তোমার দিকে নজর দেওয়া তো দূরের কথা, তোমার আশেপাশে একশো মাইলের মধ্যে আর আসবে না।

আবার রসিকতা করছ!

না রসিকতা না। সত্য বলছি। আমি কি চলে আসব?

না না। তোমার কি মাথা খারাপ!

তাহলে তুমি আসবে কবে?

পারলে তো আজই চলে আসি। কিন্তু কেউ রাজি হবে বলে মনে হয় না। বাড়িটা এত সুন্দর! আজ না আস্‌লেও আগামীকাল আসব বলে আশা করছি।

আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। আর...

এমন সময় হালিম ফিরে এলে নিদিয়া বলল, এখন রাখি, পরে কথা বলব তোমার সাথে।

এত তাড়াতাড়ির রেখে দেবে।

ফ্রি হয়ে কল করব।

আচ্ছা ঠিক আছে।

হালিম দুটো ছবি নিয়ে এসেছে। দুটোই ফ্রেমে বাঁধানো। প্রথমটা ইয়াকুব খন্দকারের স্ত্রী লায়লার ছবি। দ্বিতীয় ছবি দেখে চমকে উঠল নিদিয়া। ছবির মানুষটির চুল ছোটো ছোটো করে ছাটা, চওড়া ভুরু। চেহারায় বেশ রুক্ষতা আছে। দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। সে বিড়বিড় করে বলল, কে ঐ লোকটা?

হালিম মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না। হয়তো এই বাড়িরই কেউ হবে।

কে বলতে পারবে?

কুলসুম খালারে ডাইকা আনি, সে চিনবার পারে।

নিদিয়া ওপরে-নিচে মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিলো।

দুটো ছবি দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখল হালিম। তারপর বের হয়ে গেল। ছবিদুটো একদৃষ্টিতে দেখছে নিদিয়া। লায়লা একটা কমলা রঙের শাড়ি পরা, গলায় মুক্তোর মালা। চুল পেছনে খোঁপা করা বাঁধা। নিদিয়ার মনে হচ্ছে, সে সত্যি নিজের ছবি দেখছে।

পাশের ছবিটার ব্যক্তি একটা নীল রঙের পাঞ্জাবি পরা। পাঞ্জাবির বোতামও নীল। মুখে খোদা খোদা দাগ। শরীরের রং শ্যামলা ছিল বলেই অনুমান করল নিদিয়া। চেহারায় বিরক্তির ছাপটা স্পষ্ট, লক্ষণীয় আর কিছু নেই।

কুলসুম খালা দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। ছবিটা দেখেই বলল, এইডা তো খন্দকারের ছবি!

নিদিয়া কাঁপা কণ্ঠে বলল, আপনি কি ঠিক চিনতে পারছেন?

হুঁ, ঠিকই চিনছি। আমার চোখের সামনে বড়ো হইছে। এই ছবি পাইলেন কোথায়?

নিদিয়া উত্তর দিলো না।

হালিম চলে যাচ্ছিল। নিদিয়া তাকে ছবিদুটো নিয়ে যেতে বলল। তার পেছন পেছন গেল কুলসুম খালা।

নিদিয়ার খুব দুর্বল লাগছে। তার মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তাই বসে পড়ল বিছানায়। চোখের সামনে সবকিছু ঘুরতে শুরু করেছে এখন। যেন নিয়ন্ত্রণ না হারায় এজন্য শুয়ে পড়ল। তারপর জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল।

এতে কিছুটা হলেও ভয় কাটল তার। তবে অস্বস্তি কাটল না। তার অবচেতন মন যেন বলতে থাকল, সামনে বিপদ, ভয়ংকর বিপদ!

নিদিয়া চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। খুট শব্দ হতে চোখ খুলে তাকাল সে। দেখল কুলসুম খালা ভেতরে প্রবেশ করেছে। হাতে মাল্টার জুস। সে কিছু বলার আগেই কুলসুম খালা বলল, বাবুর্চি পাঠায়ছে। আপনে নাকি পছন্দ করেন?

নিদিয়া উঠে বসে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু এখন খেতে ইচ্ছে করছে না খালা।

কেন?

ক্ষুধা নেই।

কষ্ট কইরা বানায়ছে, খাইয়া ফেলান।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জুসটা খেলো নিদিয়া। এখন কিছুটা ভালো লাগছে তার, শরীরে যেন শক্তি ফিরে পেয়েছে। ঘড়ি দেখল সে, দুপুর বারোটা বাজে। কী করতে পারে এখন সে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। খন্দকার আর লায়লার ছবিদুটো শুধু তার চোখের সামনে ভাসছে। বারবার চেষ্টা করেও ভুলতে পারছে না। বই পড়ার চেষ্টাও করেছে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

কুলসুম খালা গ্লাস হাতে চলে যাচ্ছিল। সে পেছন থেকে ডেকে উঠে বলল, খালা, আপনে এই বাড়ি সম্পর্কে কতটুকু জানেন?

খালা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সবই জানি আপা। এই বাড়ির শুরু থাইকা শেষ পর্যন্ত আমিই আছিলাম।

আমার কী মনে হয় জানেন?

কী মনে হয়?

এই বাড়িতে কোনো রহস্য আছে।

রহস্য তো আছেই। চাইরজন মানুষ মার্ডার হইছিল এই বাড়িতে। কিন্তু ক্যামনে মার্ডার হইছে তা পুলিশ বাইর করবার পারে নাই। আ...আর...

আর কী?

এই বাড়িতে মার্ডার হওয়ার পর থাইকা অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে।

কী ঘটনা।

এই খন্দকার বাড়িতে মেলা গাছপালা থাকলেও দ্যাখবেন এইহানে কোনো পাখি নাই।

পাখি নেই মানে!

আপনি তাইলে লক্ষ করেন নাই আপা। আসলে এই বাড়িতে মার্ডার হওয়ার আগে আমি কাম করতাম। আমার সাথে লায়লা আপা মানে খন্দকারের বউয়ের ভালো সম্পর্ক আছিল, এই কথা আমি আপনেরে আগেও বলছি। আমি তারে আপা ডাকতাম। আর আমারে হে ডাকত খালা। যাইহোক, ঐ সময় এই বাড়িতে মেলা পাখি আসত। শালিক, টিয়া, ঘুঘু, চড়ুই মেলা ধরনের পাখি আছিল। এককোনায় যে বাঁশঝোপ আছে ঐহানে বক পর্যন্ত থাকত। তারপর কী হইল, যেইদিন বাড়িতে চাইরজন মানুষ খুন হইল, তারপর থাইকা আর কোনো পাখি আসে না। বিষয়ডা বড়ো অদ্ভুত।

নিদিয়া বারান্দায় এলো। বাইরে তাকিয়ে সত্যি কোনো পাখি দেখতে পেল না। এত বড়ো বাড়ি, এত গাছপালা, অথচ কোনো পাখি নেই, সত্যি বিস্ময়কর!

পেছন ফিরে বলল, পাখি না-থাকার রহস্য কী খালা?

আমার জানা নাই। তয়...

তবে কী?

পাশের গ্রামের কালু ফকির আইছিল একবার। হে বলছিল বাড়িতে কারো ছায়া আছে।

কীসের ছায়া?

মরা মানুষের।

নিদিয়া ঢোক গিলে বলল, ঠিক বুঝলাম না।

কালু ফকির বলছিল যে এই বাড়িতে যারা খুন হইছে তাগো মইধ্যে কেউ না কেউ বাঁইচা আছে।

খুন হওয়া মানুষ বেঁচে থাকবে কীভাবে?

আসলে তার আত্মা ছায়া হইয়া বাঁইচা আছে। হে নাকি দেখছে। ঐ ছায়া থাকার কারণে এই বাড়িতে কোনো পাখি আসে না। কুকুর বিড়ালও আসে না। মৃত্যুর পর কারো ছায়া বাঁইচা থাকলে ঐ মৃত্যুরে নাকি বলে ছায়ামৃত্যু। এই এলাকায় ছায়ামৃত্যুওয়ালা বাড়ি এই

একটাই।

আর কী বলেছিল কালু ফকির?

কাউরে এই বাড়িতে ঢুকবার নিষেধ করছিল। এই কথা শুনবার পর গ্রামের মানুষজন বাড়ির ভেতরে আসে না। তয় এহন পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটে নাই।

কিন্তু আপনি তো এখন এই বাড়ির ভেতরে আসছেন। এখানে কাজ করছেন।

প্যাটের দায়ে আইছি। এক পোলা আছিল, ঢাকা গ্যাছে, আর ফিরে নাই। বাড়িতে কেউ নাই। অন্যের বাড়িতে কামকাইজ কইরা খাই। এই বাড়িতে কাম পাইয়া আবার চইলা আছি।

লম্বা একটা শ্বাস নিল নিদিয়া। তারপর বলল, কালু ফকির আর কী কী বলেছিল?

অতকিছু মনে নাই। আসলে কালু ফকিরের কথার কোনো দাম নাই। কালা একটা ঝোলা নিয়া ঘুইরা বেড়ায়, আর ঝাড়ফুঁক দিয়া অসুখবিসুখ সারায়। কেউ কেউ তারে বিশ্বাস করে, আবার কেউ করে না।

আপনি কি বিশ্বাস করেন?

খালা আমতা-আমতা করে বলল, করি আবার করি না।

আপনি কী মনে করেন এই বাড়িতে সত্যি কোনো আত্মা আছে?

জানি না। তয় পশুপাখি না-থাকার বিষয়ডা বড়ো আজব।

আপনার ভয় করে না?

আমার তো কেউ নাই, বয়সও হইছে অনেক। ভয় ডর কইমা গেছে। যে কয়দিন বাঁইচা আছি, খাবার পাইলেই হয়।

গ্রামের অন্য কেউ কি দেখেছে ছায়াটাকে?

না হুনি নাই। তয় আপনি এত প্রশ্ন করতেছেন ক্যান?

নিদিয়া আবারও জোরে শ্বাস নিল। তারপর টেনে টেনে বলল, আমার কী মনে হয় জানেন খালা, সত্যি এই বাড়িতে মৃত মানুষের একটা ছায়া আছে। ছায়াটা বড়ো ভয়ংকর।

কথাটা শোনার সাথে সাথে খালা নিজের বুকে নিজেই ফুঁ দিলো। যদিও সে বলছিল তার ভয় কমে গেছে, কিন্তু তার আচরণে সেরকম মনে হলো না। বেশ ভয় পেয়েছে বলেই মনে হলো নিদিয়ার কাছে।

তোতলাতে তোতলাতে খালা বলল, ছায়াডা কার?

খন্দকারের!

খ...খন্দকার।

হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস সে এই বাড়িতে হেঁটে বেড়ায়।

কী বলতেছেন এইসব!

নিদিয়া মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ খালা সত্য বললাম। কালু ফকিরের কথাই হয়তো সত্য। আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। কীভাবে বলব?

কালু ফকির থাকে পাশের গ্রামে। বড়ো একটা বটগাছের নিচে তার আস্তানা। আমি খোঁজ নিয়া দেখি।

কথাগুলো বলে কুলসুম খালা দ্রুত বের হয়ে গেল। সে যে সত্যি ভয় পেয়েছে তার দ্রুত বের হয়ে যাওয়া দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল।

পুকুরে জাল ফেলা হয়েছিল। অনেক বড়ো মাছ উঠেছে। দুটো রুইমাছ পাওয়া গেল ওজন বিশ কেজির বেশি। বোয়াল কাতলও আছে। জেলে জানাল, পুকুরের গভীরতা এত বেশি যে জাল দিয়ে সব মাছ ধরা যাবে না। মাছ ধরতে হলে সেচে ফেলতে হবে পুকুর। কথাগুলো শোনার পর খুশিই হলেন শাফায়েত আহমেদ। তার পাশে নিদিয়া দাঁড়িয়েছিল। বললেন, দেখেছিস, কত মাছ পুকুরে!

তুমি কি পুকুর সেচে ফেলবে বাবা?

হ্যাঁ সব মাছ ধরব। তারপর নতুন করে চাষ করব। প্রত্যেক বছর পুকুরে অনেক মাছ চাষ করা যাবে। মাছ চাষ করেই লাখ লাখ টাকা আয়া করা যাবে এই পুকুর থেকে।

আমার কী মনে হয় জানো বাবা?

কী মনে হয়?

এই বাড়িতে মাছ চাষ করা ঠিক হবে না।

শাফায়েত আহমেদ বেশ অবাকই হলেন নিদিয়ার কথা শুনে। বললেন, কেন?

বাড়িটা যেন কেমন!

কী বলছিস!

তুমি কি লক্ষ করেছ এই বাড়িতে কোনো পাখি নেই। কত গাছ বাড়িটাতে। অথচ একটা পাখিও নেই কোথাও।

শাফায়েত আহমেদ এবার নিজে চারদিকে তাকালেন। তারপর বললেন, সত্যিই তো, কোথাও কোনো পাখি নেই। কেন?

তুমি জানতে চাও?

অবশ্যই চাই।

এই বাড়িতে একটা মৃত মানুষের আত্মা আছে। ঐ আত্মাটা বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এজন্য কোনো পাখি আসে না।

কীসব আজেবাজে কথা বলছিস!

আমি সত্য বলছি বাবা। এজন্য বলছি এই বাড়ি আমাদের রাখার দরকার নেই। বিক্রি করে দাও। বাড়িটা ভালো না, খন্দকার নামের যে ব্যক্তির বাড়িটি ছিল, তার আসলে ছায়ামৃত্যু হয়েছিল। ছায়ামৃত্যু হলে মানুষের আত্মা তার নিজের বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। তখন ভয়তে ধারেকাছে কেউ ঘেঁষে না। এজন্য বাড়িটি এতদিন ফাঁকা পড়েছিল। কেউ কিনতে চায়নি। কিন্তু তুমি কিনেছ। এখন বিক্রি করে দাও।

তোকে এসব কথা কে বলল?

আমি জেনেছি বাবা, সব সত্য। চলো ঢাকায় চলে যাই।

কী বলছিস! ঢাকায় যাব কীভাবে? সন্ধ্যার পর আমি এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্কুলের শিক্ষক-সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দিয়েছি। তাদের নিয়ে বসে একসাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করব। আার তুই কি না বলছিস চলে যাওয়ার জন্য। তা কীভাবে হয়?

আসলে কী জানো বাবা?

কী?

আমি খন্দকারের ঐ আত্মাটাকে দেখেছি। আমার ভালো মনে হয়নি আত্মাটাকে।

শাফায়েত আহমেদ নিদিয়ার কথার পাত্তা দিলেন না। উলটো বললেন, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যা ঘরে যা, হাত-মুখ ধুয়ে নে। খেতে বসব। ক্ষুধা লেগেছে।

তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না বাবা?

তুই কি বিশ্বাস করার মতো কথা বলছিস। আধুনিক যুগে ভূতপ্রেত, আত্মা আসবে কোথা থেকে? আর মানুষের মৃত্যু হলে আবার আত্মা বেঁচে থাকে কীভাবে?

নিদিয়া খানিকটা হতাশ কণ্ঠে বলল, পাশের গ্রামের কালু ফকির আছে। তাকে তুমি খবর দাও। তার কাছ থেকে সবকিছু জানতে পারবে। আমার বিশ্বাস, আমি সত্য কথা বলছি। আমাদের দ্রুত এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়া উচিত। আর তোমার উচিত বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া। তা না হলে পরে দাম পাবে না।

কথাগুলো বলে দ্রুতপায়ে পুকুরপাড় থেকে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল নিদিয়া।

শাফায়েত আহমেদ বেশ অবাকই হলেন। নিদিয়াকে তিনি চেনেন। অত্যন্ত বাস্তববাদী মেয়ে। আলতুফালতু কথা বলার মেয়ে সে নয়। এজন্য চাইলেও মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না ছায়ামৃত্যুর

বিষয়টা। আসল রহস্যটা কী তিনি বের করতে চান। তার মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় কেউ বাড়িটা আরো কম দামে কেনার জন্য একটা ভয়ংকর গল্প তৈরি করে রেখেছে। সেই গল্পটা কোনো না কোনোভাবে শোনানো হয়েছে নিদিয়াকে। নিদিয়া ভয়ও পেয়েছে। এজন্য আর থাকতে চাচ্ছে না এই বাড়িতে।

দুপুরে খাওয়ার পর স্ত্রী রুবিনার সাথে আলোচনায় বসলেন শাফায়েত আহমেদ। রুবিনা সবকিছু শুনে বলল, নিদিয়া আমাকেও বলেছে যে এই বাড়িতে সে থাকতে চায় না।

তাহলে এখন কী করবে?

থাকতে না চাইলে চলে যাওয়াই ভালো।

গেলে কি সমাধান হবে? ও তো আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবে না। মিথ্যা একটা ধারণা নিয়ে বাড়ি ত্যাগ করবে, তখন আমাদেরও আসা হবে না।

তাহলে কী করবে?

আমি বরং কালু ফকিরকে খবর দেই। দেখি কালু ফকির কী বলে?

ঠিক আছে।

শাফায়েত আহামেদ বারান্দায় এলেন। হালিমকে বললেন, কালু ফকিরকে খুঁজে বের করতে। আরো জানালেন যে বিকেলে তিনি গ্রামে হাঁটতে যাবেন, যেন সেই ব্যবস্থা করা হয়।

হালিম মাথা ঝাঁকিয়ে বের হয়ে গেল।

শাফায়েত আহমেদ হেঁটে হেঁটে বাড়ির সামনে এলেন। তারপর মাথা উঁচু করে তাকালেন বাড়িটির দিকে। সত্যি বাড়িটি সুন্দর, দারুণ সুন্দর। অথচ এরকম একটা বাড়িতে থাকতে চাচ্ছে না নিদিয়া, ভাবতেই কেমন যেন লাগছে তার। অবশ্য একটা রহস্যের কিনারা তিনি করতে পারছেন না। সত্যিই বাড়ির কোথাও কোনো পাখি নেই, একটাও না। এত বড়ো বাড়িতে কোনো পাখি থাকবে না, বিষয়টা সত্যিই বিস্ময়কর।

শাফায়েত আহমেদ ফোন করলেন জুনায়েদ শিকদারকে। জুনায়েদ শিকদার তার বন্ধু, ঢাকা ভার্সিটির প্রাণিবিজ্ঞানের প্রফেসর। ফোন ধরতে কুশলাদি বিনিময়ের পর পাখি না-থাকার কারণ জানতে চাইলেন। জুনায়েদ আহমেদ নিজেও কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। শেষে বললেন, আমি এসে দেখব।

কবে আসবে?

কয়েকটা দিন সময় লাগবে।

দ্রুত আসতে পারলে আমার জন্য সুবিধা হবে।

আমি তোমাকে আজই জানাব।

ঠিক আছে।

ফোন কেটে দিয়ে শাফায়েত আহমেদ আবার তাকালেন গাছগুলোর দিকে। না নেই, একটা পাখিও নেই। এখন সত্যি সত্যি তার ভয় করছে। মনে হচ্ছে আসলেই এই বাড়িতে কারো ছায়ামৃত্যু হয়েছে এবং মৃত ঐ ব্যক্তির ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির মধ্যে। তিনি অবশ্য ঠিক করলেন, ভয়টা প্রকাশ করবেন না, নিজের মধ্যেই রাখবেন। নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শুধু তথ্যসংগ্রহ করবেন।

পড়ন্ত বিকেল।

নিদিয়া বাড়ির পেছনের দিকে এসেছে। এপাশে একটা গোলাপ বাগান আছে। দীর্ঘদিনের অযত্ন অবেহলায় গাছগুলোর বেহাল দশা। একটা গাছে বেশ কিছু হলুদ গোলাপ ফুটে আছে। বহুদিন পরে হলুদ গোলাপ দেখল নিদিয়া। কাছে গিয়ে একটা ফুল ছিঁড়ে নিল সে। ফুলটা দেখতে সুন্দর হলেও কোনো গন্ধ নেই।

নিদিয়া ভেবেছিল খানিকটা এগিয়ে যাবে। বাড়ির শেষপ্রান্তে কী আছে দেখবে। কিন্তু একা যাওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। কেমন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় খন্দকারের ছায়াটাকে সে দেখতে পাবে। তাই আর এগোল না। ঘুরে বাড়ির পথ ধরল। সিঁড়ির কাছাকাছি আসতে দেখা হলো তার মা রুবিনার সাথে। চেয়ারে বসে আছেন। নিদিয়া নিজে থেকে বলল, শরীরের কী অবস্থা মা?

ভালো।

প্রেশার কী আছে?

দুপুরের পর আর মাপিনি। তবে ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। কোথায় গিয়েছিলি তুই?

বাড়ির পেছনের দিকে। ওখানে একটা গোলাপ বাগান আছে। এই যে গোলাপটা নিয়ে এলাম।

একা একা এদিক-ওদিক যাসনে।

আমি তো থাকতেই চাচ্ছি না মা। চলো ঢাকায় চলে যাই।

আমি তোর বাবাকে বলেছিলাম। আজ যেতে চাচ্ছে না। কাল সকালে যাবে। রাতে নাকি গ্রামের মানুষজন আসবে।

এই ঝামেলা দরকার আছে এখন?

তোর বাবা চাচ্ছে, কী আর করবি?

আমার কিন্তু এই বাড়িতে ভালো লাগছে না। আগেও বলেছি, এখনো বলছি। বাড়িটাকে কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হয়। আমার ধারণা, এখানে ভয়ংকর কিছু ঘটবে।

তোর বাবাকে বলেছিস কথাটা?

হ্যাঁ বলেছি।

কী বলল?

তেমন কিছু বলেনি।

ভয় পাসনে। দরকার হলে রাতে আমি তোর কাছে ঘুমাব।

তোমার দরকার নেই। কুলসুম খালাকে বলে রেখো।

আচ্ছা ঠিক আছে।

নিদিয়া ভেতরে প্রবেশ করল। নিচতলায় যে সিঁড়িটা নেমে গেছে ঐ সিঁড়ি দিয়ে তখন ওপরে উঠে এসেছে হালিম। নিদিয়াকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, ঘরগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসলাম।

কীসের ঘর?

নিচে যেইগুলা আছে। অনেক দামি জিনিসপত্র আছে।

ও আচ্ছা। ছবিদুটো কোথায়?

যেইঘরে আছিল সেইঘরে রাইখা দিছি। তয় আপা, বিষয়ডা আসলেই অবাক হওয়ার মতো।

কোন বিষয়?

ছবি আর আপনের চেহারার মিল। খন্দকারের স্ত্রীর চেহারা এক্কেবারে আপনের মতো।

হ্যাঁ আমি নিজেও অবাক হয়েছি। যাইহোক, তুমি ভেবো না। পারলে খালাকে বলো, আমাকে এক কাপ চা দেওয়ার জন্য। চা খেতে ইচ্ছে করছে।

ঠিক আছে আপা।

নিজের রুমে প্রবেশ করে নিদিয়া বিছানার ওপর বসল। এই বাড়িতে অদ্ভুত যা যা ঘটছে তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে শুরু করল সে। অদ্ভুত বিষয়টা শুধু তার ক্ষেত্রেই ঘটছে। অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। এজন্য কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না ব্যাপারটা। তবে ছবির বিষয়টা সত্য। তার সাথে খন্দকারের স্ত্রী লায়লার চেহারার হুবহু মিল রয়েছে। এই বিষয়টাকেও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না কেউ। কারণ দুজন মানুষের চেহারার মিল থাকতেই পারে। তবে বিষয়টা

কাকতালীয় না অশরীরীয়, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এর পেছনে যুক্তিটা হলো, এই বাড়িতে কোনো পাখি নেই। গাছপালায় পূর্ণ একটা বাড়িতে পাখি থাকবে না, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রয়োজন। ঢাকায় গিয়ে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কারো সাথে কথা বলবে বলে সে ঠিক করল।

বিপ...বিপ...

শব্দ শুনে মোবাইল ফোনের দিকে তাকাল নিদিয়া। ফোন করেছে রোমেল। মনটা তার ভালো হয়ে গেল। ফোন ধরে বলল, এক্কেবারে ঠিক সময়ে ফোন করেছ।

তাই নাকি?

হুঁ।

আর ভালো লাগছে না।

কেন?

তুমি ঢাকায় নেই।

ঢাকায় থাকলেই বা কী হতো? তোমার সাথে তো আর এখন থাকতাম না।

তা থাকতে না। তবে মনে কেমন যেন শান্তি পেতাম।

এটা কোনো যুক্তি হলো?

তুমি বুঝবে না। আসলে কী জানো, মেয়েদের প্রতি ছেলেদের যে মনের টান তা মেয়েরা কখনোই বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলেই প্রেম ভালোবাসার মূল আনন্দটা উপভোগ করতে পারে না।

নিদিয়া টেনে টেনে বলল, তো সাহেব, আমি কোনো আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না?

আসো ঢাকায় আসো, তোমাকে বুঝিয়ে দেবো।

ফোনে বলো।

সব আনন্দ তো ফোনে উপভোগ করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু আনন্দ উপভোগ করার জন্য কাছে থাকতে হয়, পাশে বসতে হয়, চোখে চোখে তাকাতে হয়, হাতে হাত...

আর না, আর না, অনেক হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি না বাপু, সামনে আরো অনেক লম্বা জীবন পড়ে আছে। ধীরে ধীরে...

কথার মাঝে চা নিয়ে এলো কুলসুম খালা। বেডসাইড টেবিলে

রেখে বলল, কালু ফকিররে পাওয়া যায় নাই। তয় বড়ো সাহেব লোক পাঠায়ছে।

ঠিক আছে খালা। পাওয়া গেলে নিয়া আসবেন।

খালা চলে গেলে রোমেল বলল, কালু ফকির কে?

তুমি শুনতে পেয়েছ?

হ্যাঁ।

আর বোলো না। এই বাড়ির মালিকের নাম ছিল খন্দকার। তার ছায়ামৃত্যু হয়েছিল। এইজন্য আত্মাটা বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। ঐ আত্মা সম্পর্কে জানার জন্য কালু ফকিরকে খুঁজছি আমরা।

আবার কী আবোল-তাবোল বকছ!

ঢাকায় এসে তোমাকে বলব। অত চিন্তা কোরো না। নাস্তা করে নিয়ো। এখন রাখি।

আচ্ছা ঠিক আছে।

লাইন কেটে দিলো নিদিয়া। তারপর চায়ের কাপ হাতে এলো আয়নার সামনে। মাথার চুল আঁচড়াতে লাগল আর চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। বড়ো আয়নায় সম্পূর্ণ কক্ষটা দেখা যাচ্ছে। সন্দেহজনক কিছু নেই। আয়নায় শুধু তার প্রতিচ্ছবি। সে সুন্দর, সত্যি সুন্দর। এজন্যই হয়তো রোমেল তাকে এত পছন্দ করে! আবার খন্দকারও তাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। বিষয়টা অবিশ্বাস্য! অথচ ঘটছে। কীভাবে ঘটছে তার ব্যাখ্যা জানা নেই। এজন্যই মনের কোনায় কোথায় যেন অস্বস্তি কাজ করছে। অস্বস্তি থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না।

বাড়িতে দশটা পর্যন্ত মানুষজন থাকল। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্কুলের শিক্ষক, ক্রীড়াপ্রেমী-সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শাফায়েত আহমেদই মূলত তাদের সাথে কথা বলেছেন। বাড়িকে ঘিরে একটা রিসোর্ট তৈরির স্বপ্নের কথা তিনি বলেছেন সবাইকে। এতে গ্রামের কী উপকার হবে তাও ব্যাখ্যা করেছেন। একবাক্যে সবাই তাকে সহায়তা করবে চলে জানিয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে খন্দকারের বিষয়টি তুলেছিলেন শাফায়েত আহমেদ। যতটুকু জানতে পেরেছেন তা হলো খন্দকার গ্রামের এতিমখানায় বড়ো হয়েছে। তবে তার স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না। বাউন্ডুলে টাইপের ছিল। হঠাৎই সে বড়োলোক হয়ে যায়। সবার ধারণা সবজি আর মাছের ব্যবসার আড়ালে সে কুমিল্লা বর্ডার থেকে ঢাকায় মাদক চালান করত। মাদকের ব্যবসা করে অঢেল সম্পদ অর্জন করেছিল সে। চোরাচালানের সাথেও সাথেও যুক্ত ছিল। একবার ঢাকায় পুলিশের কাছে ধরাও খেয়েছিল। তারপর থেকে গ্রামেই থাকত। মানুষের সাথে খুব একটা মিশতও না। অঢেল সম্পদ থাকলেও গ্রামের জন্য তেমন কিছু সে করেনি, করেছে শুধু নিজের বাড়িটা। এজন্য গ্রামের মানুষের শ্রদ্ধাও অর্জন করতে পারেনি। বড়োরা তাকে যেমন খন্দকার বলে ডাকত, ছোটোরাও পেছনে ডাকত খন্দকার নামে। নামের পাশে সাহেব কিংবা ভাই কিছুই যোগ হয়নি। শেষের দিকে বেশ বদমেজাজি হয়ে উঠেছিল, যাকে-তাকে বকাঝকা করত। এজন্য বেশ কয়েকবার সালিশেও বসেছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান। একবার নাকি কাকে মারধরও করেছিল। এতে গ্রামের সবাই খুব খেপে গিয়েছিল তার ওপর। ঐ ঘটনার পর কিছুদিন ঢাকায় ছিল। তারপর হঠাৎ বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেঠে নতুন বাড়িতে। বিয়ের ছয় মাসের মাথায় মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুরহস্য এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

মেহমানরা চলে গেলে শাফায়েত আহমেদ ওপরে উঠে এলেন। রুবিনা তখন নিদিয়ার কক্ষে ঢুকছে। একটা বই পড়ছিল নিদিয়া। উঠে বসে বলল, সবাই চলে গেছে মা?

হ্যাঁ। আমি কি তোর সাথে ঘুমাব?

না মা, দরকার হবে না।

ভয় পাবি না তো আবার?

না পাব না। তুমি চিন্তা কোরো না।

কুলসুম খালাকে বলতে পারি। সে না হয় তোর সাথে ঘুমাক।

দরকার নেই। তবে সকালে কিন্তু আমরা চলে যাব।

হ্যাঁ, তোর বাবাও ঐরকম বলেছে। নাস্তা করে রওনা দেবো আমরা।

যাও তুমি তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো।

রাতে প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকিস।

ঠিক আছে মা।

রুবিনা চলে গেলে নিদিয়া দরজা আটকে দিলো। বারান্দায় প্রবেশের দরজা আর জানালাও আটকালো সে। তারপর ঢুকল বাথরুমে। সময় নিয়ে চোখেমুখে পানি দিলো। তোয়ালেতে মুখ মুছে এসে বসল বিছনার ওপর। আগেই ঠিক করে রেখেছে আজ তাড়াতাড়ি ঘুমাবে। লাইট বন্ধ না করেই শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও ঘুম এলো না তার। শেষে টিভি চালু করল। সমুদ্রে নীল তিমি সংরক্ষণবিষয়ক একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে। বেশ মনোযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটা দেখল সে। টিভি বন্ধ করে যখন চাদর মুড়ি দিলো তখন রাত সাড়ে এগারোটা।

হঠাৎই বাথরুমে খুট একটা শব্দ হলো। শব্দটাকে প্রথমে পাত্তা দিলো না নিদিয়া। কিন্তু শব্দটা হতেই লাগল। একটু পরপর খুটখুট শব্দ। বড়ো বিরক্তিকর, ভয়েরও বটে। কীসের শব্দ বুঝতে পারছে না সে। শব্দটা এরকম যেন কেউ একজন হাতুড়ি দিয়ে আলতোভাবে লোহার কোনো জিনিসকে আঘাত করছে। বাথরুমে এরকম শব্দ হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। শেষে উঠে বসল। ধীরপায়ে এগিয়ে গেল বাথরুমের দরজার সামনে। দরজা এপাশ থেকে বন্ধ। ভেতরে কারো থাকার প্রশ্নই আসে না। বেশ ভয় করছে নিদিয়ার,

ঢোক গিলতে গিয়েও পারল না। গলায় আটকে গেল। এদিকে শব্দটা ভেতরে হচ্ছে তো হচ্ছেই। দেরি করতে থাকলে ভয় আরো বাড়বে, এরকম একটা ভাবনা থেকে দ্রুত দরজা খুলল সে। না, ভেতরে কেউ নেই। কোথাও কোনো শব্দও হচ্ছে না। বেশ অবাক হলো নিদিয়া। আবার সে ফিরে এলো খাটে। সাইড টেবিলের ওপর পানি রাখা। পুরো এক গ্লাস পানি খেলো। কিন্তু তারপরও ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে। সে নিশ্চিত শব্দ সে ঠিকই শুনেছে, কোনো ভুল হয়নি। কিন্তু কীভাবে সৃষ্টি হলো ঐ শব্দ? উৎস খুঁজে না পাওয়ায় ভয় আর আতঙ্ক থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। একবার ঠিক করল উঠে গিয়ে সে তার মাকে ডাক দেবে। পরে মত পালটাল। সিদ্ধান্ত নিল শুয়ে পড়ার।

নিদিয়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের মাথায় আবার শব্দ হতে শুরু করল বাথরুমে। তারপর রুমের মধ্যকার লাইটটা একা একাই বন্ধ হয়ে গেল। লাইট কেন বন্ধ হলো ঠিক বুঝতে পারল না সে। স্থিরভাবে শুয়ে থেকে সে অনুধাবন করার চেষ্টা করল কী ঘটছে। কয়েক সেকেন্ড এভাবেই কেটে গেল। হঠাৎ সে উপলব্ধি করল সে ছাড়াও কেউ একজন আছে রুমের ভেতর। চাদরের ভেতরে থাকায় দেখতে পাচ্ছে না সে। তবে কেউ যে আছে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত, কারণ হাঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

কে হাঁটছে যখন ভাবছে নিদিয়া, তখনই কানের কাছে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, নিদিয়া, আমারে শুনবার পাইতেছ। আমি খন্দকার।

নিদিয়ার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, খ...খ...খন্দকার।

হ্যাঁ। তোমারে নিবার আইছি।

কোথায়?

পুকুরের ঐপাশে একটা টিলা আছে। টিলার ওপর লাল একটা ঘর আছে, ঐ ঘরে।

ভয়ে নিদিয়ার আত্মা শুকিয়ে আসার উপক্রম হলো। সে অস্পষ্টস্বরে বলল, কেন?

কা...কারণ তুমি আমার স্ত্রীর মতো দ্যাখতে। তোমারে নিয়া এখন আমার টিলার ছোট্ট ঐ ঘরে যাবার ইচ্ছা করতেছে।

না আমি যাব না।

তোমার যাওয়াই লাগবে।

না... না... আমি যাব না।

এই বাড়িতে তুমি আমার অবাধ্য হবার পারবা না। তোমার বুঝা লাগবে যে, আমি তোমারে মেলা ভালোবাসি। আমার ভালোবাসার মর্যাদা তোমারে দিতে হবে, আমারে তোমার ভালোবাসতে হবে।

নিদিয়া এবার বেশ জোরে বলে উঠল, না, আমি আপনাকে ভালোবাসতে পারব না। আপনি একটা ছায়া...

আমি ছায়া হইলেও আমার মইধ্যে একটা আত্মা আছে। ঐ আত্মা শুধু তোমারে ভালোবাসে, শুধুই তোমারে। এইজন্য তোমার ভালোবাসাও আমার চাই। তুমি আমারে ভালোবাসবা, শুধুই ভালোবাসবা।

না...না...

জোরে চিৎকার করে ওঠার চেষ্টা করল নিদিয়া। কিন্তু পারল না। খন্দকারের একটা হাত চেপে বসল তার মুখের ওপর। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও সে মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিতে পারল না। উলটো খন্দকার তাকে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে ফেলল। তারপর তাকে তুলে নিল পাঁজাকোলে। আর তখনই সুযোগটা পেল নিদিয়া। বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করে উঠল কয়েকবার। এতে খুব বিরক্ত হলো খন্দকার। সে আবার মুখ চেপে ধরল নিদিয়ার। তারপর অনেকটা টেনে জোর করে নামিয়ে আনল নিচে। কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলল, আমার কথার অবাধ্য হইলে ভয়ানক বিপদ হবে তোমার।

তারপরও নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল নিদিয়া। কিন্তু পারল না। সে স্পষ্ট উপলব্ধি করল তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসেছে খন্দকার। এখন বাগানের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কিন্তু কোথায়? অনুমান করতে চেষ্টা করল সে। লাল টিলায় হলে কেউ তাকে সহজে খুঁজে পাবে না। তাই শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে আবারও চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু লাভ হলো না। মুখের ওপর খন্দকারের শক্ত হাত থাকায় উমউম ছাড়া কোনো শব্দ বের হলো না।

হঠাৎই শরীরের ওপর থেকে সরে গেল চাদরটা। নিদিয়া স্পষ্ট

দেখতে পেল খন্দকারের ছায়াটাকে। ধূসর রঙের একটা পোশাক পরা, মাথাটা একটা ঝোলানো কাপড়ে ঢাকা। তবে মুখ দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে তাকাতে বুঝল খন্দকার তাকে লাল টিলায় টেবিলের ওপর এনে বসিয়েছে। চারদিকে শুধু গাছ আর ঝোপঝাড়। বাঁচতে হলে চিৎকার করা ছাড়া উপায় নেই বুঝতে পেরে সে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে আবারও চিৎকার করে উঠল। এতে খুবই বিরক্ত হলো খন্দকার। একহাতে গলা টিপে ধরল নিদিয়ার। তারপর চেপে শুইয়ে দিলো টেবিলের ওপর। অসহায় নিদিয়া ছটফট করতে লাগল। খন্দকার এবার রুক্ষ গলায় বলল, আমি তোরে ছাড়ব না, তোর কাছ থাইকা আমার ভালোবাসা আদায় কইরা ছাড়ব। তুই জানিস না, আমি কত নিষ্ঠুর, কত নির্মম। সবকিছুর বিনিময়ে হইলেও তোরে আমার পাওয়া লাগবে।

এই প্রথম খন্দকার 'তুই' করে সম্বোধন করল। এতে আরো ভয় পেয়ে গেল নিদিয়া। অনুভব করল, ভয় আর আতঙ্কে তার শরীরের শক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে। তার কেন যেন বারবার মনে হতে লগাল, ছায়ারূপী খন্দকার কোনো মানুষের অবয়ব না, একটা ভয়ংকর পিশাচের অবয়ব।

নিদিয়ার অনুমানই সত্য হলো। খন্দকারের ছায়াটা এখন ধীরে ধীরে তার ওপর ঝুঁকে আসছে। কী করতে যাচ্ছে খন্দকার? অনুমান করে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল নিদিয়ার। সে তার দুই হাতে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করল ছায়াটাকে। কিন্তু পারল না। ছায়াটা এখন সত্যি যেন একটা মানুষের শরীরের রূপধারণ করেছে। হাত দিতে শুরু করেছে তার বুকে। নিদিয়া শরীরের সমস্ত শক্তিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল সে।

এমন সময় দূরে ডাক শুনতে পেল সে, নিদিয়া, নিদিয়া।

ডানে মাথা ঘোরাতে দেখল তার বাবা, মা, কুলসুম খালা আর হালিম আসছে। তাদের হাতে টর্চলাইট। তার নাম ধরে ডাকছে তার বাবা।

নিদিয়া আবারও চিৎকার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এখন হাত-পা কিছুই নাড়াতে পারছে না। ছায়াটা ধীরে ধীরে তার শরীরের

সাথে মিশে যাচ্ছে। তীব্র একটা ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে শরীরে। নিদিয়া সহ্য করতে পারছে না। মনে হচ্ছে প্রত্যেকটি লোমকূপ দিয়ে হাজার হাজার সুঁই তার শরীরে প্রবেশ করছে। এক সময় ব্যথাটা আর সহ্য করতে পারল না সে, জ্ঞান হারাল।

সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষণ হলো।

ঢাকার সেন্ট্রাল কিউর হাসপাতালের ক্যাবিনে শুয়ে আছে নিদিয়া। তাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তরপর অ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হয় ঢাকায়। জ্ঞান ফিরে আসে দুপুরে। খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন শাফায়েত আহমেদ এবং রুবিনা। নিদিয়ার জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন তারা।

ক্যাবিনের বেডে শুয়ে আছে নিদিয়া। রুবিনা তার পাশে। হাত ধরে আছে নিদিয়ার। নিদিয়া টেনে টেনে বলল, বাবা কোথায় মা?

ডাক্তারের সাথে কথা বলছে।

ঐ বাড়িটাতে আমরা আর যাব না।

তোর বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাড়িটা বিক্রি করে দেবে।

তাই করো মা। বড়ো ভয়ংকর, ঐ খন্দকার বড়ো ভয়ংকর!

থাক, তুই ঐ কথা আর ভাবিস না। কপাল ভালো যে সময়মতো আমরা পৌঁছাতে পেরেছিলাম। আর তোকে উদ্ধার করতে পেরেছি। তা না হলে কী সর্বনাশ যে হতো! কুলসুম খালা প্রথম তোর চিৎকার শুনেছিল। সেই ডেকে তোলে আমাদের। যাইহোক, কিছু খাবি?

না মা, ক্ষুধা নেই।

এখন কেমন লাগছে?

ভালো, তবে হালকা মাথাব্যথা আছে।

শুয়ে থাকার চেষ্টা কর। আমি মাথা টিপে দেই।

হ্যাঁ দাও।

রুবিনা চেয়ার টেনে নিদিয়ার একেবারে কাছে এসে বসলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা টিপে দিতে লাগলেন। নিদিয়ার ভালো লাগছে। তাই আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে এলো তার।

রুবিনা মাথা টিপতে টিপতে বললেন, নিদিয়া, তোর মোবাইল

ফোনে রোমেল নামের এক ছেলে বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। কে ছেলেটা?

নিদিয়া একটু সময় নিল। তারপর বলল, আমার পরিচিত মা।

কেমন পরিচিত?

বন্ধু।

আমার কাছে তো খুব ভদ্রই মনে হলো। কথাবার্তাও সুন্দর। আমাকে বেশ সম্মান করে কথা বলল।

হ্যাঁ মা, রোমেল খুব ভালো আর ভদ্র ছেলে।

মনে হচ্ছে, তোর সাথে দেখা করতে চায়।

আমি সুস্থ হলে দেখা করব মা।

তুই সুস্থই আছিস। শুধু বিশ্রাম নিচ্ছিস। ডাক্তার বলেছে, কোনো সমস্যা নেই, ইচ্ছে করলে এখনই বাড়িতে যেতে পারব। তারপরও একটা দিন আমরা এখানে থেকে যাব।

ঠিক আছে।

তুই কি রোমেলের সাথে কথা বলতে চাস?

নিদিয়া কোনো উত্তর দিলো না।

কথা বলবি রোমেলের সাথে? ও আবার ফোন করেছে। ঐ যে, তোর ফোন বাজছে। রিসিভ করব?

নিদিয়া চোখ বন্ধ করে ছিল। সে টেনে টেনে বলল, না।

'না' শব্দটা শুনে চমকে উঠলেন রুবিনা। তিনি যে গলাটা শুনেছেন সেটা নিদিয়ার না। পুরুষের কণ্ঠ। কীভাবে সম্ভব? নিদিয়া পুরুষের মতো কথা বলবে কীভাবে? তিনি যে ভুল শুনেছেন এরকমই যেন বিশ্বাস করতে চাইছেন। কিন্তু মন থেকে শঙ্কা কাটছে না। তাই নিদিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে ডাক দিলেন, নিদিয়া।

কোনো উত্তর নেই।

নিদিয়া, নিদিয়া, শুনতে পাচ্ছিস আমাকে?

নিদিয়ার কোনো উত্তর পেলেন না তিনি। শ্বাসপ্রশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে, বুঝলেন ঘুমিয়ে পড়েছে নিদিয়া। তিনি মাথা টিপতেই থাকলেন। তবে মনের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন।

এদিকে শাফায়েত আহমেদ কথা বলছেন ডাক্তার নাজমুল

হাসানের সাথে। নাজমুল হাসান এবং শাফায়েত আহমেদ একসাথে কলেজে পড়েছেন। তাদের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গাঢ়। নাজমুল হাসানের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হয়েছে নিদিয়া। প্যাথলজিকাল রিপোর্টগুলো দেখে তিনি বললেন, না, সবই ঠিকই আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

শাফায়েত আহমেদ ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কিন্তু একটা বিষয় আমি বুঝতে পারছি না।

কোন বিষয়?

রাতে বাইরে গিয়েছিল কেন নিদিয়া? সত্যি কি ঐ বাড়িতে খন্দকারের আত্মা রয়েছে?

নাজমুল হাসান দম নিয়ে বললেন, না, তোমার ধারণা সত্য নয়। মৃত মানুষের আত্মা পৃথিবীতে থাকতে পারে না। মৃত মানুষ মৃতই। তবে হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি, তাতে একটা বিষয় প্রমাণিত। আর তা হলো খন্দকারের স্ত্রীর চেহারা আর নিদিয়ার চেহারা একইরকম। এই চেহারার মিলের বিষয়টি নিদিয়াকে প্রভাবিত করেছে। ব্যাপারটাকে সে হয়তো মেনে নিতে পারেনি। এজন্য সে বারবার চলে আসতে চাইছিল ঐ বাড়ি থেকে। তোমার ফিরে না-আসার সিদ্ধান্ত তার মনের ওপর একরকম চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের কারণে অবচেতন মন তার অজান্তে কিংবা অনিচ্ছায় খন্দকারের একটা অবয়ব তৈরি করে যা সে দেখতে পাচ্ছিল এবং তার মনের মধ্যে একরকম ভয়ের সৃষ্টি হচ্ছিল। আমার ধারণা রাতে শোয়ার পর এই চাপটা এত বেশি ছিল যে সে সহ্য করতে পারছিল না এবং একাই ঢাকা যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে পারেনি। ঘুমের মধ্যে থাকায় ভুল পথে উঠে যায় টিলার ওপর। যখন সে আবার বাস্তবে ফিরে আসে তখন ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। ঐ চিৎকার শুনে তোমরা ছুটে গিয়েছিলে।

তোমার ব্যাখ্যা হয়তো ঠিক আছে, কিন্তু আমার মন কেন যেন মানছে না। তাহলে নিদিয়া চাদর নিয়ে গিয়েছিল কেন?

সব হিসেব প্রথম দিনে মিলাতে চেষ্টা কোরো না। ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে। আপাতত বিপদ কেটেছে, এজন্য শুকরিয়া আদায় করো।

তা ঠিক বলেছ।

এখন কি চলে যাবে, নাকি আজ থাকবে?

আজ রাতটা থেকেই যাই।

তাহলে আগামীকাল সকালে আমি আবার দেখব নিদিয়াকে। তারপর ডিসচার্জের অনুমতি দেবো।

আচ্ছা।

শাফায়েত আহমেদ ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে বের হয়ে এলেন। মনটা তার শান্ত হওয়ার কথা থাকলেও কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছেন। তার অবচেতন মন বলছে, সামনে তাকে আরো অনেক বড়ো বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।

নিদিয়া বাসায় ফিরে এসেছে। নিজেকে একেবারে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার। শরীরটাও ঝরঝরে লাগছে। কারণ রাতে হাসপাতালে ভালো ঘুম হয়েছে। সকাল থেকেই ভাবছিল ফোন করবে রোমেলকে। কিন্তু সুযোগ হয়নি। এখন সুযোগ পেয়ে ফোন করল। ওপাশে রোমেল যেন তার ফোনের জন্যই বসেছিল। সে বলল, তু...তু...তুমি কেমন আছো নিদিয়া?

এখন ভালো।

আমি তো চিন্তায় অস্থির হয়ে গেছি। কী হয়েছিল?

এখন বলব না। আগামীকাল তোমার সাথে দেখা করব। তারপর বলব।

আজ দেখা করবে না কেন?

হাসপাতাল থেকে আজ আমাকে বাসায় থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আহারে! অনেকদিন তোমার সাথে দেখা করতে পারছি না।

আমি বুঝতে পারছি, তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ।

শুধু অস্থির না। আমার যে কী হয়েছে তোমাকে বলতে পারব না। গতাকল তো আমি হাসপাতালেও গিয়েছিলাম।

নিদিয়া অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

হুঁ। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেছি। ক্যাবিনে প্রবেশের সাহস পায়নি। তোমার আম্মাকে অবশ্য কয়েকবার দেখেছি।

মা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। তুমি ফোন করেছিলে। তোমার নাম দেখে জানতে চাচ্ছিল, তুমি কে? তুমি কী করো? তোমার সাথে কথা বলতে চাই কি না?

কী বলছ!

হ্যাঁ।

আর...

আমার ধারণা তোমার আর আমার সম্পর্কের বিষয়ে মা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পেরেছে। মায়ের মন তো, অনেককিছু বুঝে যায়। তবে আমি অতকিছু বুঝতে দেইনি। শুধু বলেছি বন্ধু।

শুধু বন্ধু বলেছ!

নিদিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, জি, আপাতত এর বেশি বলার দরকার নেই। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে বলি। হুটহাট করে সবকিছু বলা ঠিক না। দুজনে পরামর্শ করে তারপর এগোব। যাইহোক, এখন বলো, আগামীকাল কোথায় দেখা করবে?

তুমি যেখানে বলবে।

আশেপাশে কোথাও ঘুরতে যাব।

আমার কোনো আপত্তি নেই। সেক্ষেত্রে আমাকে ছুটি নিতে হবে।

হ্যাঁ ছুটি নাও। আমাকে তুমি টিএসসি থেকে উঠিয়ে নেবে।

তাই হবে।

দুজনের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ কথা হলো। অতঃপর বাথরুমে প্রবেশ করল নিদিয়া, খুলে ফেলল পরিধানের সকল কাপড়। ফ্লোর থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা আয়না আছে বাথরুমে। সেই আয়নায় ভালোমতো পরীক্ষা করল শরীরটাকে। না, কোথাও কোনো দাগ নেই। খন্দকারের ছায়াটা যে তার শরীরে একটা আঁচড়ও দিতে পারেনি, এ ব্যাপারে সে এখন শতভাগ নিশ্চিত। এজন্য নিজের মধ্যে দারুণ এক প্রশান্তি অনুভব করছে সে। প্রশান্তিটাকে আরো উপভোগ্য করতে ঝরনা ছেড়ে দিলো। হালকা গরম পানির উষ্ণতা তার মনটাকে একেবারে ফুরফুরে করে দিলো।

নিদিয়াদের দোতলা ডুপ্লেক্স বাড়ি। নিচতলায় ড্রয়িংরুমে বসে আছেন রুবিনা আহমেদ। তার ঠিক সামনে বসে আছে কালু ফকির, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। কালু ফকির মানুষটা আসলেই কালো। মুখে দাড়ি থাকায় তাকে যেন আরো কালো মনে হচ্ছে। তবে দাঁতগুলো ধবধবে ফরসা এবং সুন্দর। মানুষটার শরীরের পুরো পোশাকও কালো, কালো তার কাঁধে ঝোলার মতো ব্যাগটাও। ব্যতিক্রম তার নিষ্পাপ অবয়বের মুখচ্ছবি। যে-কেউ দেখলে অনুমান করবে মানুষটা খুব সহজসরল এবং নিষ্পাপ। রুবিনাই তাকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন। সাথে কুলসুম খালা আর হালিম এসেছে।

কালু ফকির সোফায় বসে বারবার ওপরের দিকে তাকাচ্ছে। রুবিনা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার ফকির বাবা? কিছু খুঁজছেন?

এই বাড়িতে আপনেরা কত বছর থাকেন?

অনেক বছর। আমি বিয়ের পর থেকেই আছি।

এই বাড়িতে কোনো অঘটন কি ঘটছে?

কী অঘটন?

কারো অপমৃত্যু হইছে?

অপমৃত্যু মানে?

কেউ গলায় ফাঁস দিয়া মরছে, বিষ খাইছে কিংবা ছাদের ওপর থাইকা লাফ দিয়া পড়ছে, কিংবা...

কিংবা কী?

অন্য কোনোভাবে আত্মহত্যা করছে।

না, এরকম কোনো ঘটনা এই বাড়িতে ঘটেনি। কিন্তু কেন?

আমার লক্ষণ ভালো মনে হইতেছে না।

কী বলছেন এসব!

আমার মনে হইতেছে এই বাড়িতে কোনো মৃত মানুষের আত্মা আছে। আত্মাডা ভালো না। যে-কোনো সময় কারো ক্ষতি করবার পারে।

রুবিনা নড়েচড়ে বললেন। তারপর তোতলাতে তোতলাতে বললেন, এ...এক বা...বাড়ি থেকে পালিয়ে আমরা নিজের বাড়িতে এসে উঠলাম। আর এখন বলছেন এই বাড়িতে মৃত মানুষের আত্মা আছে। কী সর্বনাশ!

বাড়ির সবার সাথে কথা বললে বুঝবার পারব। তার আগে বলেন আমারে কেন ডাকছেন?

রুবিনা একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, খন্দকারের বাড়িতে কি আসলেই খন্দকারের আত্মা ঘুরে বেড়ায়?

হঁ ঘুইরা বেড়ায়। কারণ তার মৃত্যু হয় নাই। হইছিল ছায়ামৃত্যু। যারা আত্মহত্যা করে, তাগো মইধ্যে কারো কারো ছায়ামৃত্যু হয়। যার ছায়ামৃত্যু হয় তার আত্মা পৃথিবীতে ঘুইরা বেড়ায়। খন্দকারের ছায়ামৃত্যু হইছিল। এইজন্য তার আত্মা ঐ বাড়িতে আছে। এই আত্মাগুলা বড়ো ভয়ংকর হয়। তয় সুবিধা হইল, আত্মাগুলো মানুষের শরীর ছাড়া বাড়ির বাইরা যাবার পারে না। আবার সন্ধ্যার আগে কারো কোনো ক্ষতি করবার পারে না। আমার কী মনে হইতেছে জানেন?

কী মনে হইতেছে?

আপনেগো কারো শরীরে কইরা খন্দকারের আত্মা এই বাড়িতে আইছে।

আ...আ...

আপনে ভয় পাবেন না। আপনের শরীরে ঐ আত্মা নাই। থাকলে টের পাইতাম। আপনের স্বামীর শরীরেও নাই। কারণ হে এহন বাড়িতে নাই। কুলসুম খালা আর হালিমের শরীরেও নাই। থাকলে বুঝবার পারতাম।

তাহলে কার শরীরে আছে?

সম্ভবত আপনের মেয়ের শরীরে। কী যেন নাম তার, নিদিয়া, নিদিয়া আপা। তারে ডাকেন, আমি বুঝবার পারব।

না না, ওকে ডাকা যাবে না। শুনলে ভয় পাবে ও। আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন কীভাবে?

তার সাথে কথা বললেই বুঝবার পারব।

রুবিনা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সাহস পাচ্ছেন না। কারণ তিনি নিদিয়ার কণ্ঠে পুরুষালি কণ্ঠ শুনেছেন। ঐ কণ্ঠের রহস্য তাকে জানতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন যেভাবেই হোক নিদিয়াকে তিনি কালু ফকিরের সামনে আনবেন। তখন নিশ্চিত হতে পারবেন, আদৌ খন্দকারের আত্মা নিদিয়ার মাধ্যমে এই বাড়িতে এসেছে কি না।

শাফায়েত আহমেদ বাসায় এলে সবকিছু খুলে বললেন রুবিনা। শাফায়েত আহমেদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো পুরো বিষয়টা। নিজে থেকেই বললেন, তুমি কি সত্যি পুরুষের কণ্ঠে কথা বলতে শুনেছ নিদিয়াকে?

আমি নিজের কানে শুনেছি।

কতবার?

একবারই শুনেছি।

আমার মনে হয় তুমি ভুল শুনেছ।

আমার নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস আছে। ভুল শুনিনি। আর কালু ফকিরের কথা শুনে আমার সন্দেহ আরো বেড়েছে।

কোথায় থাকতে দিয়েছ কালু ফকিরকে।

বাড়ির উত্তরপাশে কেয়ারটেকারের যে ঘর আছে ওখানে, পাশের ঘরগুলোতে অন্যরা আছে।

এখন কী করতে চাচ্ছে কালু ফকির?

নিদিয়ার সাথে কথা বলতে চায়।

খন্দকার বিষয়ে নিদিয়ার সাথে কথা বলা কি ঠিক হবে? প্রচণ্ড মানসিক চাপ পড়বে ওর ওপর। তখন দেখা যাবে আর এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

যদি কথা না বলি এবং সত্যি খন্দকারের আত্মা এই বাড়িতে এসে থাকে তাহলে নিদিয়ার অনেক বড়ো ক্ষতি হবে। তাই আগেভাগেই নিশ্চিত হতে চাচ্ছি। কালু ফকির যেভাবে বলছে তাতে নিশ্চিত এই বাড়িতে একটা ভয়ংকর আত্মা আছে। তা খন্দকারেরই হোক, কিংবা অন্য কারো হোক। এই আত্মাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে না পারলে মহাবিপদে পড়ব আমরা।

শাফায়েত আহমেদ নড়েচড়ে বসে বললেন, আসলে কী জানো? এইসব ফকির-টকিরের স্বভাবচরিত্র ভালো হয় না। সব ধান্দাবাজ।

কাল্পনিক একটা গল্প তৈরি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তারপর ঐ আতঙ্ক আর ভয় দূর করবে বলে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

রুবিনা মাথা নেড়ে বলল, আমার সেরকম মনে হচ্ছে না। আমি তাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে নেয়নি। শুধু দুই কেজি আদা কিনে দেওয়ার জন্য বলেছে। আদা কিনে দিয়েছি।

আদা দিয়ে কী করবে?

আদার তাবিজ আর মালা মানাবে। অশুভ ঐ আত্মাগুলো নাকি আদার ঝাঁঝওয়ালা গন্ধ সহ্য করতে পারে না। আদার তাবিজ সাথে থাকলে বিপদ নাকি অনেকটাই কমে আসে।

আমাদের কী সবার এখন তাবিজ পরতে হবে?

আমি জানি না কালু ফকির কী সিদ্ধান্ত দেবে।

আমার কি মনে হয় জানো?

কী?

তোমার ঐ কালু ফকিরকে বাসায় এনে ঠিক করো নি।

খন্দকার বাড়িতে থাকার সময় তুমিই তো সংবাদ দিয়েছিলে ওকে।

তা দিয়েছিলাম। কিন্তু ঢাকায় আসার পর তো খবর দেইনি। যাইহোক, এসে যখন পড়েছে তখন আত্মার উপস্থিতির বিষয়টা নিশ্চিত হওয়াটাই উত্তম হবে। তুমি বরং নিদিয়াকে কালু ফকিরের কথা বলো। আর জানাও যে, খন্দকার বাড়ির খন্দকারের আত্মা সম্পর্কে জানার জন্যই এসেছে কালু ফকির, তার সাথে কথা বলতে চায়।

আমি এরকমই ভাবছিলাম।

আমার কেন যেন ভালো লাগছে না।

অত চিন্তা কোরো না। একটা সমাধান বের হবেই।

রুবিনা কথা শেষ করে নিদিয়ার রুমে এলেন। নিদিয়া রাজি হয়ে গেল কালু ফকিরের সাথে কথা বলতে। বরং তার উৎসাহ বেশিই দেখা গেল। বলল, ঐ খন্দকারের আত্মাটাকে মারতেই হবে।

রুবিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, এজন্যই কালু ফকিরকে ডেকে এনেছি।

তুমি ঠিক কাজ করেছ। তা না হলে ভবিষ্যতে অন্য কারো ক্ষতি

করবে আত্মাটা। খুবই ভয়ংকর ঐ আত্মা।

তুই সবকিছু খুলে বলবি কালু ফকিরকে।

তুমি কোনো চিন্তা কোরো না মা। সত্যি যদি ছায়াটাকে মারতে পারে, তাহলে ভালো পুরস্কার দেবে তাকে।

তা তো দিবোই।

আরো কিছু টুকটাক কথাশেষে নিদিয়ার রুম থেকে বের হয়ে এলেন রুবিনা। তার নিজের মধ্যকার অস্থিরতাটা এখনো কাটেনি। ডাইনিংরুমে এসে এক গ্লাস পানি খেলেন তিনি। তারপর এসির নিচে বসলেন। অন্তত বাতাসে যেন শরীরটা ঠান্ডা হয়, এই আশায়।

শাফায়েত আহমেদ, রুবিনা আর কালু ফকির বসেছে ডাইনিং টেবিলে। একটা পেয়ালায় আদার পানি রাখা। পানি থেকে আদার হালকা ঝাঁঝওয়ালা গন্ধ আসছে। এই গন্ধ সহ্য করতে পারবে না খন্দকারের আত্মা, যদি নিদিয়ার শরীরে আত্মাটা থাকে তাহলে নিদিয়া এখানে বেশি সময় বসেও থাকতে পারবে না। কথাগুলো শাফায়েত আহমেদ আর রুবিনাকে জানিয়ে রেখেছে কালু ফকির।

নিদিয়া এসে বসল রুবিনার পাশে। প্রথমেই নাক সিঁটকে বলল, কীসের গন্ধ মা?

কই, কোনো গন্ধ নেই তো?

রুবিনা এমন ভাব করলেন যেন কিছুই জানেন না।

না না, ঐ যে পেয়ালার পানি, কীসের পানি?

এবার কালু ফকির বলল, আদার পানি।

কী ঝাঁঝ রে বাবা! বসা যাচ্ছে না। আমার চোখ-মুখ জ্বালা করছে।

ঝাঁঝ তো তেমন নেই।

না গন্ধটাও উৎকট।

শাফায়েত আহমেদ এবার বললেন, কই আমরা তো অতটা পাচ্ছি না। বরং ভালোই লাগছে।

এই পানি কি এখানে রাখার প্রয়োজন আছে?

থাকলে কী সমস্যা?

প্লিজ বাবা, সরিয়ে ফেলো।

কালু ফকির এবার পেয়ালাটা ধরল। তারপর টেনে আনতে শুরু

করল নিজের দিকে। পেয়ালাটা যখন ঠিক সামনে তখন ফুঁ দিলো পেয়ালার ওপর। এতে পেয়ালার ওপরের বাতাস গিয়ে লাগল উলটো পাশে বসা নিদিয়ার শরীরে। সাথে সাথে নিদিয়া বলে উঠল, ইস, কী যন্ত্রণা!

কালু ফকির এবার পেয়ালা থেকে পানি নিয়ে সবার ওপরে ছিটিয়ে দিলো। শাফায়েত আহমেদ আর রুবিনা স্থির থাকলেও নিদিয়া স্থির থাকতে পারল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, উহ্, শরীরটা এমন জ্বলছে কেন? আমি আর থাকব না এখানে। কীসব উদ্ভট কা*কারখানা।

কথাগুলো বলে উঠে গেল নিদিয়া। রুবিনা তাকে বসাতে চেষ্টা করেও পারলেন না। রুমে ঢুকে নিদিয়া সরাসরি ঢুকল বাথরুমে। তারপর গোসল করতে শুরু করল। তার শরীর সত্যি জ্বলে যাচ্ছে। একমাত্র গোসলই যেন তার জ্বালাযন্ত্রণা কমাতে পারবে।

সন্ধ্যার কিছু আগে রুবিনা ঢুকলেন নিদিয়ার রুমে। নিদিয়া মাথা আঁচড়াচ্ছিল। ফিরে তাকাতে রুবিনা বললেন, কিরে, বিকেলে নাস্তা করলি না যে!

ক্ষুধা নেই মা।

ডাক্তার তোকে খাওয়াদাওয়া করতে বলেছে।

ক্ষুধা লাগলে খাব। এখন শুধু চা খেতে ইচ্ছে করছে।

সাথে করে নিয়ে এসেছি। এই যে নে।

নিদিয়া চা হাতে নিয়ে মুখে দিতে গিয়ে আবার রেখে দিলো। রুবিনা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, রেখে দিলি কেন?

কেমন যেন ঝাঁঝ? গন্ধটাও যেন কেমন?

গন্ধ হবে কেন? আর ঝাঝ তো হালকা থাকবে, আদা চা তো। তুই আদা চা পছন্দ করিস।

না, আদা চা খাব না।

কথাগুলো বলে চায়ের কাপটা দূরে ঠেলে দিলো নিদিয়া। তারপর পিরিচ দিয়ে ঢেকে রেখে বলল, আগামীকাল ভার্সিটিতে যাব মা।

কখন যাবি?

সকালে।

আমি ড্রাইভারকে বলে রাখব। কিন্তু তোর তো ক্লাস নেই, কেন যাবি?

লাইব্রেরিতে কাজ আছে।

পরে করলে হতো না। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিলে তোর জন্য ভালো হতো। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোর শরীরটা দুর্বল।

লাইব্রেরির কাজটা শেষ করে ফেলি। আর তাছাড়া বাসায় বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

না-লাগারই কথা। অন্য কোনো খাবার দিব?

না। কালু ফকির কোথায়?

কেয়ারটেকারের ঘরে আছে। কেন?

খন্দকার সম্পর্কে তাকে তো বিস্তারিত বলা হলো না। আচ্ছা, পরে না হয় বলব। আমাদের বাড়িতে কি থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে।

কয়দিন থাকবে।

থাকুক কয়েকদিন। ফকির মানুষ, কোথায় যায়, কোথায় থাকে, ঠিক নেই। দুই-একদিন এই বাড়িতে বসে খাওয়াদাওয়া করলে সমস্যা কোথায়? আমাদের তো আর অভাব নেই।

আমি না-থাকার কথা বলিনি মা। শুধু জানতে চেয়েছি থাকবে কি থাকবে না বা কতদিন থাকবে। থাকলে তার সাথে কথা বলব।

রুবিনা উৎসাহিত হয়ে বললেন, এখন বলবি?

না, আগামীকাল।

ঠিক আছে, আমি তাকে বলে রাখব।

চায়ের কাপটা নিয়ে বাইরে এলেন রুবিনা। ডাইনিং টেবিলে কাপ রেখে বসলেন সোফায়। শাফায়েত আহমেদ আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। বললেন, কি, চা খেলো?

না। কেমন যেন গন্ধ গন্ধ লাগছে নিদিয়ার কাছে।

তার মানে কালু ফকির ঠিকই বলেছে।

হ্যাঁ, সে-ই আদা চায়ের বিষয়টা পরীক্ষা করতে বলেছিল। আমি সত্যি বিস্মিত হয়েছি। যে নিদিয়া আদা চা ছাড়া থাকতে পারত না, দুই দিনের ব্যবধানে সে আদা চা এখন সহ্য করতে পারছে না। কী অদ্ভুত!

এখন আমরা কী করব?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কালু ফকিরের কথাই শুনতে হবে আমাদের।

চলো তাহলে, কালু ফকিরের ঘরে যাই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শাফায়েত আহমেদ। তারপর বাড়ির বাইরে এলেন। তার পেছন পেছন এলো রুবিনা। খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে তাদের। এই একদিনেই যেন অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন তারা।

ঘরে বিছানা থাকলেও কালু ফকির মেঝেতে মাদুরে বসে তাবিজ বানাচ্ছিল। শাফায়েত আহমেদ ঘরে ঢুকলে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, স্যার, এই তাবিজ থাকলে চিন্তা নাই, আপনেগো আর ক্ষতি করবার

পারবে না খন্দকারের আত্মা।

শাফায়েত আহমেদ বললেন, কিন্তু নিদিয়ার কী হবে?

বলবার পারতেছি না। বড়ো বিপদে আছে হে। কারণ কী জানেন? যার ছায়ামৃত্যু হয়, তার আত্মা এই পৃথিবী ছাইড়া যাবার চায় না। মানুষের মইধ্যে থাকবার চায়। খন্দকারের আত্মা আছে নিদিয়ার মইধ্যে। এই আত্মাগুলা নিজের বাড়িতে থাকলে সারাদিন জাইগা থাকে। বাইরা কোথাও থাকলে খালি সন্ধ্যার পর জাইগা ওঠে। তহন যার শরীরে থাকে তারে দিয়া যা খুশি করাবার পারে। এই বাড়ির আত্মা জাগবে সন্ধ্যার পর। এইজন্য দেখার বিষয় সন্ধ্যার পর নিদিয়া মা কী করে। যা বুঝবার পারতেছি, খন্দকারের আত্মার নজর নিদিয়া আপার ওপর। এইজন্য অন্য কারো ক্ষতি করার কথা না। কিন্তু কেউ যদি তার ইচ্ছার বাধার কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাইলে ঐ আত্মা কাউরে ছাড়বে না। এইডাই সমস্যা।

নিদিয়ার মধ্যে এই আত্মা কতদিন থাকবে?

সারাজীবন।

রুবিনা চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, কী বলছেন ফাকির বাবা!

সত্য বলতেছি। বড়ো খারাপ ঐ আত্মা।

এখন উপায়?

আত্মাডারে মারতে হবে। কিন্তু ক্যামনে মারবেন, এইডাই কথা। ছায়ামৃত্যুর আত্মারে মারা বড়ো কঠিন। যার শরীরে থাকে তার শরীরের মইধ্যে একটা সম্পূর্ণ ধাতব ছুরি ঢুকায় দিয়া লাগবে। কাঠের কিংবা প্লাস্টিকের বাঁট হইলে হবে না। সম্পূর্ণ ধাতুর বাট হওয়া লাগবে। ছুরিটা হওয়া লাগবে চিকন কলমের মতো। এইরকম একটা ছুরি আগে বানানো লাগবে। ছুরিডা চব্বিশ ঘণ্টা আদার পানিতে ডুবায় রাইখা তারপর শরীরের মইধ্যে ঢুকানো লাগবে। সমস্যা হইতেছে যার শরীরে আছে তার মৃত্যু ঘটবার পারে। খন্দকারের আত্মারে মারার জন্য নিদিয়ার শরীরে ছুরি ঢুকাইলে হে নাও বাঁচবার পারে। তাই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা ঠিক হবে না। দ্বিতীয় আরেকটা উপায় হইল, আত্মাডা যহন ছায়ার আকারে বাইর হবে তহন আত্মার শরীরে ঐ ছুরিডা ঢুকায় দিয়া। কিন্তু ঐরকম সুযোগ এই বাড়িতে পাওয়া যাবে না। কারণ আত্মা নিদিয়ার শরীর ছাড়া বাইরা বাইর হবে না। যদিও হয় খালি হয়তো নিদিয়ার সামনে বাইর হবে। তয় যদি খন্দকার বাড়িতে যাওয়া যায়, তাইলে ঐ বাড়িতে আত্মাডা বাইরাই থাকবে

বেশিরভাগ সময়, তখন আমি সুযোগডা পাব।

রুবিনা চোখদুটো আরো বড়ো বড়ো করে বলল, আবার ঐ খন্দকার বাড়িতে যাব! আপনার কি মাথা খারাপ! নিদিয়া জীবনেও যাবে না।

এইডাই সমস্যা।

আপাতত আপনেরা দুইডা তাবিজ নিয়া নেন। তারপর দেখি নতুন কোনো উপায় পাওয়া যায় কি না। তয় আত্মাডারে খুন করা বড়ো কঠিন কাজ হবে। আমি ভাবতেছি নিদিয়ার কোনো আবার ক্ষতি হইয়া না যায়। তারে আদার তাবিজ দিলে হে পরবে না। ফেলায় দিবে। তারপরও চেষ্টা করতে হবে। যাইহোক, আগে ধাতব ছুরি পাওয়া যায় কি না দেখি, যদি না পাই তাইলে তৈরি করা লাগবে।

কথাগুলো বলতে বলতে কালু ফকির শাফায়েত আর রুবিনা আহমেদের বাম হাতের বাহুতে দুটো আদার তাবিজ বেঁধে দিলো। একই সাথে বাড়ির অন্য সবাইকেও তাবিজ দিলো। এখন অন্তত বাড়ির সবাই খন্দকারের আত্মা থেকে নিরাপদ থাকবে।

নিদিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম তার হঠাৎ ভেঙে গেছে। রাত কত অনুমান করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। রুমের মধ্যে জিরো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। দেওয়ালঘড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এত রাতে ঘুম ভাঙার কারণ কী অনুমান করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পেল না।

নিদিয়া নিদিয়া।

অস্পষ্ট একটা ডাক শুনতে পেল নিদিয়া। অবাক হয়ে বলল, কে?

আমি খন্দকার।

কোন খন্দকার?

তোমার স্বামী খন্দকার।

আমি বিয়ে করিনি আপনাকে।

তুমি আমারে বিয়া করছ। তুমি দ্যাখতে হুবহু লায়লার মতো, আমার স্ত্রী। যেহেতু তোমার আর লায়লার চেহারা একইরকম সেইজন্যই তুমি আমার স্ত্রী।

না, আমি আপনার স্ত্রী না।

অবশ্যই স্ত্রী। আর আ...আমি তোমারে ভালোবাসি, তুমিও আমারে ভালোবাস।

না, আমি আপনাকে ভালোবাসি না।

ক্যান?

নিদিয়া টেনে টেনে বলল, আমি রোমেল নামের একজনকে ভালোবাসি। সেও আমাকে খুব ভালোবাসে। আমরা বিয়ে করব বলে মনস্থির করেছি।

না, তুমি আমার স্ত্রী। তুমি দ্বিতীয় কাউরে বিয়া করবার পারো না। তুমি শুধু আমারেই ভালোবাসবা, শুধুই আমারে।

আমার ভালোবাসা আমার ভালোলাগার ওপর নির্ভর করবে, আপনার ইচ্ছের ওপর নয়।

তোমার বুঝতে হবে আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা। আমার অবাধ্য তুমি হবার পারবা না। কারণ তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমারে ভালোবাসি।

আপনি একই কথা বারবার বলছেন। আমি আপনাকে ভালোবাসি না। আপনাকে ঘৃণা করি। আপনি আর আমার কাছে আসবেন না।

আমি তোমার মইধ্যেই আছি। চাইলেও চইলা যাবার পারব না। তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমি বাঁচব না। আর তোমারে ছাড়া আমার যাওয়ারও উপায় নাই। আমি তোমার শরীরের মইধ্যে কইরা এই বাড়িতে আইছি। খুব বেশি হইলে তোমার থাইকা দশ-বারো ফুট দূরে যাবার পারব, তার বেশি না। আমারে তোমার মইধ্যে, কিংবা তোমার সংস্পর্শে থাকা লাগবে। নয়তো আমার বাড়িতে ফিরা যাওয়া লাগবে, সেইক্ষেত্রে তুমিই আমারে নিয়া যাবা। ঐখানে বাঁইচা থাকার জন্য আমার তোমার শরীরের মইধ্যে থাকা লাগবে না। আমি আমার বাড়িতে ইচ্ছামতো ঘুরবার পারব। চলো দুইজনে আমার বাড়িতে চইলা যাই।

নিদিয়া কাত হয়ে শুয়ে আছে। সে আসলে বুঝতে পারছে না যা কিছু ঘটছে, তা সত্য না স্বপ্ন। তার ইচ্ছে করছে ঘুমিয়ে পড়তে, কিন্তু ঘুম আসছে না। আবার ইচ্ছে করছে উঠে বসতে, তাও পারছে না। কারণ শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আছে, চোখের পাতা পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না সে।

তুমি কি যাবা আমার বাড়িতে?

আবার প্রশ্নটা কানে এলো নিদিয়ার।

না যাব না।

কেন?

ঐ বাড়ি আমি পছন্দ করি না। ঐখানে গেলে আমার ভয় করে।

ভয়ের কিছু নাই। আমি থাকব তোমার পাশে।

আপনাকেও আমার খুব ভয় করে।

আমাকে ভয় করবে কেন?

আ...আ...প...নি।

হ্যাঁ বলো।

আ...আসলে আপনাকে আমি পছন্দ করি না।

তুমি আমারে কষ্ট দিতেছ নিদিয়া। আমি কষ্ট পছন্দ করি না।

আমি শুধু আমার স্ত্রীর ভালোবাসা চাই। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি আমার স্ত্রী এবং এটাই সত্য।

কথার মাঝেই নিদিয়া দেখল বিছানার পাশে খন্দকারের ছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ যেন উদয় হয়েছে ছায়াটা। ধূসর একটা কাপড়ে প্যাঁচানো শরীর, মাথায় কান পর্যন্ত ঘোমটা। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। খুব ভয় পেয়ে গেল সে। উঠে বসার চেষ্টা করেও পারল না। শরীরে যেন কোনো শক্তি নেই। সে বিড়বিড় করে বলল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

খন্দকারের ছায়াটা এবার হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর টেনে টেনে বলল, না তুমি যা কিছু দেখতেছ সবই বাস্তব। এই যে আমি খন্দকার, তোমার সামনে বসে আছি।

আপনি চলে যান।

আমি যাব না। আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নাই।

বাড়ি আছে আপনার। ঐ বাড়িতে যান।

আগেই বলছি ঐ বাড়িতে তোমারই আমারে নিয়া যাওয়া লাগবে।

বড়ো কষ্ট দিচ্ছেন আপনি।

আমি কষ্ট দিতেছি না, ভালোবাসবার চেষ্টা করতেছি তোমারে। তোমার আমার সম্পর্ক শুধুই ভালোবাসার। লায়লার মৃত্যুর পর বড়ো কষ্ট পাইছি আমি। দিনের পর দিন অপেক্ষা করতেছিলাম লায়লার মতো কাউরে পাওয়ার জন্য, শ্যাষে তোমারে পাইছি। তোমারে আমি আর হারাবার চাই না। তোমার ভালোবাসা নিয়া আমি বাঁইচা থাকবার চাই। দুইজনে সুখী হবার চাই।

তা কখনো সম্ভব না।

সম্ভব হইতেই হবে।

কীভাবে হবে?

খন্দকার খানিকটা গম্ভীর গলায় বলল, আমি জানি ক্যামনে ভালোবাসা আদায় করতে হয়, ক্যামনে ভালোবাসা পাইতে হয়। শ্যাষের দিকে লায়লাও তোমার মতো অবাধ্য হইয়া যাইতেছিল। পরিণতি তার ভালো হয় নাই। তাকে মরতে হইছে।

কীভাবে মারা গিয়েছিল সে?

আমি তারে খুন করছিলাম।

কেন!

কারণ লায়লা আমার কথা শুনে নাই। আমার সাথে প্রতারণা করছিল। আমারে ধোঁকা দিছিল। আমি চাই তুমি ঐরকম করবা না। তুমি আমারে আমার চাওয়াপাওয়ার মতো কইরা ভালোবাসবা। আমার লক্ষ্মী স্ত্রী হিসেবে থাকবা। আমি তোমারে ভালোবাসব, মেলা ভালোবাসব। তুমি হবা সুখী, চিরসুখী।

কথাগুলো বলতে বলতে খন্দকার তার ডান হাতটা রাখল নিদিয়ার মাথার ওপর। নিদিয়া সাথে সাথে বলল, না, আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না।

ক্যান?

আমারে স্পর্শ করার কোনো অধিকার তোমার নাই।

আমি তো তোমার মইধ্যেই থাকি। স্পর্শ করলে দোষ কোথায়? তারপরও যেহেতু তুমি চাইতেছ না, আমি তোমারে বিরক্ত করব না। তুমি ঘুমাও, এখন ঘুমাও, আমি তোমারে ঘুম পাড়ায় দিতেছি।

কথাগুলো বলতে বলতে খন্দকার হাত দিয়ে নিদিয়ার চোখ স্পর্শ করল। তাতে বন্ধ হয়ে এলো নিদিয়ার চোখের পাতা। নিদিয়া অবশ্য এখন চোখ বন্ধ করতে চাচ্ছে না। তাই সে চেষ্টা করতে লাগল চোখ খোলা রাখার। এক সময় সত্যি সে পারল। দেখতে পেল জানালা দিয়ে ভোরের আলো ভেতরে এসে পড়ছে।

নিদিয়া বেশ অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। খন্দকার তার সাথে যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো স্বপ্ন ছিল নাকি বাস্তব, এ বিষয়ে এখনো দ্বিধান্বিত সে। তবে তার কেন যেন মনে হচ্ছে যা কিছু ঘটেছে সবই বাস্তব ছিল।

পরেরদিন দুপুরে একটা রেস্টুরেন্টে বসেছে নিদিয়া আর রোমেল। খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর রোমেল বলল, নিদিয়া, তোমাকে আজ কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে।

নিদিয়া রোমেলের চোখে তাকাল। তারপর বলল, আমি সত্যি চিন্তিত।

কেন?

আমার কিছু সমস্যা হচ্ছে।

কী সমস্যা?

শুনতে চাও?

অবশ্যই। তোমার সমস্যা তো আমারই সমস্যা। আমাদের উচিত নিজের সমস্যা অন্যের সাথে শেয়ার করা এবং একত্রে সমাধান করা।

আমার মনে হয় না তুমি সমাধান করতে পারবে।

এ কথা বলছ কেন?

আমার সমস্যাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বুঝতে পারছি না তোমাকে বলা ঠিক হবে কি না, আর তুমি বিশ্বাস করবে কি না।

এই তো দিলে তুমি আমাকে চিন্তায় ফেলে। বলো, আমাকে বলো। আমি বিশ্বাস করি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।

নিদিয়া একটু সময় নিল। তারপর বলল, তুমি জানো আমার বাবা একটা বাড়ি কিনেছে। খন্দকারের বাড়িতে। ঐ বাড়িতে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। দুরাত ছিলামও। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয়টা হলো খন্দকারের ছায়ামৃত্যু হয়েছিল। ছায়ামৃত্যু হলো এমন এক মৃত্যু, যেখানে আত্মাটা পৃথিবীতে থেকে যায়। ঐ আত্মা আমার ওপর ভর করেছে। কারণ খন্দকারের স্ত্রী দেখতে ছিল হুবহু আমার মতো, আমি নিজে তার ছবি দেখেছি। এখন ঐ আত্মা আমার সাথে আমাদের বাড়িতে এসেছে।

রোমেল হো-হো করে হেসে উঠে বলল, তু... তুমি এসব কী

বলছ!

নিদিয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমি বলেছিলাম তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না।

আসলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি না। কেন জানো? তুমি অবাস্তব কথা বলছ।

আমি অবাস্তব কথা বলছি না, সত্য বলছি। ঐ খন্দকার আমার শরীরের মধ্যে অবস্থান করছে, আমার সাথে কথাও বলে।

রোমেল হেসে বলল, শেষ কবে কথা বলেছে?

গতরাতে।

তারপর?

তারপর আর কী, তোমার সাথে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করেছে।

আমার কথা জানল কীভাবে?

আমি বলেছি।

আমার কী মনে হয় জানো?

কী মনে হয়?

তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ আসলেই আমি তোমাকে ভালোবাসি কি না। এই পরীক্ষায় আমি পাশ করব। তোমার ঐ খন্দকারকে বলো, পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাই সত্য এবং চিরন্তন সত্য।

আমি জানি। কিন্তু আমি যা বলছি সেটাও সত্য। খন্দকারের আত্মার অস্তিত্ব আছে। ঐ আত্মা বড়ো ভয়ংকর।

রোমেল আগের মতোই হাসিহাসিমুখে বলল, আমি ঐ আত্মার থেকেও ভয়ংকর।

তুমি বিষয়টাকে হালকাভাবে নিচ্ছ।

হালকাভাবেই তো নেব। তাই না? এই যুগে কেউ ভূত, প্রেত, আত্মাকে বিশ্বাস করবে? তুমিই বলো।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমি এখন বিশ্বাস করছি। কারণ আমি ভুক্তভোগী। তোমাকে এটাও বলছি যে তুমি বিষয়টা সিরিয়াসলি নাও।

আমি এতটাই সিরিয়াসলি নিচ্ছি যে তুমি যদি চাও তাহলে আমি

এক্ষুনি তোমাকে বিয়ে করতে পারি।

নিদিয়া সোজা হয়ে বসে বলল, এখানে বিয়ের কথা আসছে কেন?

আমরা তো বিয়ে করবই, তাই না? আমি ভাবছিলাম, তুমি আবার আমাকে সন্দেহ করছ কি না।

আমরা বোধহয় ভিন্নদিকে চলে যাচ্ছি। আমি জেনেশুনে বুঝে বলছি যে আমার মধ্যে একটা আত্মা আছে। আমি বাসার কাউকে বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। তবে আমার ধারণা কী জানো?

কী ধারণা?

বাব-মা বোধহয় বুঝতে পেরেছে। কারণ তারা বাসায় একজন ফকির ডেকেছে। নাম কালু ফকির।

এবার ভুর" কুঁচকালো রোমেল। কী বলছ!

বিশ্বাস না হলে আমাদের বাসায় এসে দেখতে পারো।

আমি কীভাবে তোমাদের বাসায় যাব?

আমি জানি না তুমি কীভাবে আসবে। তবে তোমার সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন। আমি সত্যি বড়ো কষ্টে আছি। মন মোটেও ভালো নেই। মাঝে মাঝে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হয়। বাবা-মায়ের জন্যও খারাপ লাগছে। তারা না পারছে আমার সাথে কথা বলতে, আবার আমি না পারছি তাদের সাথে সবকিছু আলোচনা করতে। কোনো একটা গিরিখাতে যেন আটকে গেছি আমি। বের হতে পারছি না।

রোমেল খানিকটা সামনে ঝুঁকে এসে বলল, তুমি শান্ত হও নিদিয়া। সম্পূর্ণ বিষয়টাকে আমাদের বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার ধারণা খন্দকার বাড়ি তোমাদের সবার ওপর কোনো মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। এজন্য তোমরা আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করছ। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। বাড়িতে ওঝা ডাকার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আমার মনে হয় একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে তোমাদের সবার কথা বলা উচিত। তাহলে মূল বিষয়টা জানা যাবে। পৃথিবীতে পরিবারের সকলের মানসিক অস্থিরতায় ভোগার অনেক উদাহরণ আছে।

তুমি শুধু সাইকিয়াট্রিস্ট কেন, পাগলের ডাক্তারও নিয়ে আসতে পারো। মূল কথা হচ্ছে আমি মুক্তি চাই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আগেই বলেছি নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হয়।

তুমি আমার ওপর রেগে যাচ্ছ কেন?

রাগছি না। সত্য কথাটা বলছি, মন থেকে বলছি। আমার অবস্থানে তুমি থাকলে বুঝতে পারতে কী কষ্টে আছি আমি।

রোমেল চোখ বন্ধ করে আবার তাকাল। তারপর বলল, তোমার বাবা-মা কি জানেন যে তুমি ঢাকায়ও আত্মার অস্তিত্বের বিষয়টা জানো।

না, আমি তাদের বলিনি। হয়তো বেশি দুশ্চিন্তা করবে। তারা একটা বিশ্বাস নিয়ে আছে থাকুক।

আমার মনে হয় তোমার উচিত তাদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা তুমি শান্ত হও। আমি একটা না একটা উপায় বের করব। আগামীকাল আবার আমরা দেখা করব। আমি তোমাকে তখন বিস্তারিত পরিকল্পনা বলব। খাবার এসেছে, এখন খেয়ে নাও।

নিদিয়া অবশ্য খেতে পারল না। শুধু খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করল। রোমেল কয়েকবার চেষ্টা করল তাকে খাওয়ানোর, কিন্তু পারল না। এক পর্যায়ে রোমেল ঠিকই বিশ্বাস করল, আসলেই সমস্যায় আছে নিদিয়া। সে তাকে মনেপ্রাণে সহায়তা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

পড়ন্ত বিকেল।

শাফায়েত আহমেদ বাগানে বসে আছেন। কালু ফকির ছিল বাড়ির বাইরে। এখন ভেতরে ঢুকেছে। তাকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, স্যার, ছুরি নিয়া আইছি।

কীসের ছুরি?

ঐ যে বলছিলাম যেই ছুরি দিয়া মারা যাবে খন্দকারের আত্মারে। পুরোডাই লোহা দিয়া বানাইছি। তয় ঢাকা শহরে ছুরি বানানো মেলা ঝামেলা, এহন সব রেডিমেড পাওয়া যায়। কেউ ছুরি, বঁটি বানায় না। শ্যামপুর যাওয়া লাগছে।

শাফায়েত আহমেদ ছুরিটা দেখলেন। পেনসিলের মতো চিকন, লম্বায় ছয় ইঞ্চি হবে। ওপরে একটা খাপ আছে। তিনি বললেন, কিন্তু ঐ আত্মাটাকে আপনি পাবেন কীভাবে?

এ কথাই বলতে চাচ্ছি আপনাকে। আপাতত আমার কাজ হবে আদার পানিতে ছুরিডারে এক ঘণ্টা ভিজায় রাখা। তাইলেই ছুরিতে আত্মারে মাইরা ফেলাবার মতো শক্তি চইলা আসবে।

শাফায়েত আহমেদ একটা চেয়ারে বসেছিলেন। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার কী মনে হচ্ছে জানেন?

কী মনে হচ্ছে স্যার?

আমাদের আরো ধীরে ধীরে এগোতে হবে।

না ঠিক হবে না। খন্দকারের আত্মা বড়ো খারাপ। যে-কোনো সময় কোনো অঘটন ঘটাবে।

কীভাবে বুঝলেন?

আমরা আত্মার শক্তি বুঝবার পারি। খন্দকার বাড়িতে কোনো পাখি নাই, মনে আছে আপনার? কোনো বাড়িতে সাধারণ কোনো আত্মা থাকলে ঐ বাড়িতে পশুপাখি থাকে। খারাপ আত্মা থাকলে কিছুই থাকে

না। ওরাও ভয় পায়। খন্দকার মানুষটাও ভালো আছিল না, গ্রামে সুনাম নাই, আত্মাডাও ভালো না।

এখন আমাদের কী করণীয়?

নিদিয়া আপারে বুঝাইতে হবে যে তার ওপর খারাপ আত্মা ভর করছে। তারে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

না না, প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে পড়বে ও।

আমাগো হাতে আর কোনো উপায় নাই। আত্মাডা এহন পর্যন্ত আমাগো সামনে আসে নাই। খালি নিদিয়া আপাই দ্যাখছে। কাজেই আবার তার সামনে আসবে। আর তাছাড়া আত্মাডা তারেই পছন্দ করে। এইজন্য নিদিয়া আপার সাহায্য আমাগো লাগবেই। আর আর...

আর কী?

সবাইর তাবিজ পইরা থাকা লাগবে। আমি সবাইরেই দিছি। দারোয়ান, ড্রাইভার কেউ বাদ নাই। ভালো হইত নিদিয়া আপারে পরাইতে পারলে।

ওকে তাবিজ দেওয়া ঠিক হবে না, ভয় পাবে।

অবশ্য হে তাবিজ পরবারও পারবে না। তাবিজ তার কাছে অসহ্য মনে হবে। কারণ ঐ আত্মার তাবিজ সহ্য করার ক্ষমতা নাই। আত্মাডা আছে আপার শরীরের মইধ্যে। তাবিজ পরামাত্র শরীরে প্রচণ্ড জ্বালাযন্ত্রণা শুরু হবে। বাড়ির বাকি সবাই যেন পইরা থাকে।

কিন্তু মানসম্মান তো শেষ হয়ে গেল। সবাই বলছে, আমার মেয়েকে ভূতে ধরেছে। অফিসের কিছুলোকও জেনে গেছে ঘটনাটা।

কে কী বলতেছে তা শুনবেন না স্যার। আপনের দায়িত্ব আপনের মেয়েরে রক্ষা করা। এইজন্য যা যা করার সব করা লাগবে। এইডাই আসল কথা। আপনে বরং তার সাথে কথা বলেন, বুঝানোর চেষ্টা করেন যে তার মইধ্যে খন্দকারের আত্মা ভর করছে। আমি এক ঘণ্টা পর আপনের সাথে কথা বলব।

কালু ফকির চলে গেলে বাসার ভেতরে ঢুকলেন শাফায়েত আহমেদ। তারপর টোকা দিলেন নিদিয়ার দরজায়। নিদিয়া দরজা খুলে বলল, কী বাবা?

তোর সাথে কিছু কথা আছে।

আমার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

কেন?

আমার ঘুম আসছে।

এই অসময়ে।

হ্যাঁ বাবা। আমি ঘুম থেকে উঠে তোমাকে ডাক দেবো।

তোর কি শরীর খারাপ?

বাবা, প্লিজ আমাকে ঘুমাতে দাও, বিরক্ত কোরো না।

নিদিয়া দরজা বন্ধ করে দিলো। শাফায়েত আহমেদ বেশ অবাক হলেন। নিদিয়ার এ ধরনের আচরণ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে সে তাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। এরকম আচরণ তিনি আগে কখনো নিদিয়ার কাছ থেকে পাননি।

বেডরুমে বিছানার ওপর বসেছিলেন রুবিনা। হাতের তাবিজটি দেখছিলেন তিনি। শাফায়েত আহমেদ ভেতরে প্রবেশ করে বললেন, নিদিয়ার সাথে কথা হয়েছে?

রুবিনা মুখ তুলে তাকালেন। তারপর বললেন, বাইরে থেকে জানাল ঘুমাবে, কেউ যেন বিরক্ত না করে।

আমাকেও বলল যে সে ঘুমাবে। তোমার কী মনে হয়? নিদিয়া কি খন্দকারের আত্মার বিষয়ে কিছু বুঝতে পেরেছে?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে আজ আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

কারণ কী?

সকালে একবার বলেছিল, ওর নাকি শরীর জ্বালাপোড়া করছে।

কেন?

আমার ধারণা আমাদের হাতে আদার তাবিজ মূল কারণ। এই তাবিজের কাছে আস্‌লেই ওর শরীর জ্বালাপোড়া করে। এজন্য আমাদের এড়িয়ে থাকতে চাচ্ছে।

তোমার কথায় যুক্তি আছে।

রুবিনা হঠাৎই কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বললেন, আমার না খুব খারাপ লাগছে।

এমন একটা পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না শাফায়েত আহমেদ। তিনি পাশে বসে বললেন, মন খারাপ কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কীভাবে ঠিক হবে?

আমরা কি বিদেশে যাব কিছুদিনের জন্য?

তাতে লাভ কী? ঐ খন্দকারের আত্মা তো ওখানেও যাবে।

তা অবশ্য ঠিক।

আমার আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। একমাত্র মেয়ে আমাদের। ওর কিছু হলে আমি বাঁচব না। প্লিজ একটা কিছু করো।

শাফায়েত আহমেদ রুবিনার মাথাটা টেনে নিজের বুকে নিলেন। রুবিনা এবার হুহু করে কেঁদে উঠলেন। শাফায়েত আহমেদ উপলব্ধি করলেন তার নিজের চোখেও পানি এসেছে। ভেবেছিলেন কাঁদবেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। চোখের পানি তার নিচে গড়িয়েই পড়ল।

নিদিয়া তার রুমে শুয়ে আছে। তবে ভয় করছে তার। ভয়টা সন্ধ্যা হওয়ার ভয়। সন্ধ্যার পরই খন্দকারের আত্মার উপস্থিতি টের পায় সে। খন্দকার যে দিনে দিনে ভয়ংকর হয়ে উঠছে বুঝতে পারছে সে। এখন এটাও বুঝতে পারছে খন্দকারের সাথে একা সে পারবে না। সকলের সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে সহায়তা পাবে? বাড়ির কারো কাছে সে যেতে পারছে না। গেলেই শরীরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হচ্ছে। এমন জ্বালাপোড়া যে সহ্য করা যায় না, মনে হয় শরীরের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এর কারণও আছে, সবাই একটা করে আদার তাবিজ ব্যবহার করছে। এই তাবিজই তার শরীরে জ্বালাপোড়ার মূল কারণ।

নিদিয়া সিদ্ধান্ত নিল তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলব। তাই রুম থেকে বের হয়ে এলো। কিন্তু বাইরে আসার পরই বুঝল শরীরে আবার জ্বালাযন্ত্রণা শুরু হচ্ছে। কারণ তার রুমের বাইরেই একটা বাটিতে রেখে দেওয়া হয়েছে কাঁচা আদা। শেষে আর থাকতে না পেরে জোরে ডেকে উঠল, মা, মা।

রুবিনা তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলেন তার রুম থেকে। তার পেছন পেছন শাফায়েত আহমেদও এলেন।

এখানে আদা রেখেছে কে মা?

রুবিনা ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, মনে হচ্ছে কালু ফকির।

কেন?

রুবিনা তাকালেন তার স্বামী শাফায়েত আহমেদের দিকে। শাফায়েত আহমেদ ঢোক গিলে বললেন, কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

আমি গন্ধ সহ্য করতে পারছি না। এখনই সরিয়ে ফেলতে বলো।

নিচে ড্রয়িংরুমে আরো কয়েকটা বাটিতে আদা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কালু ফকির আর কুলসুম খালা। কালু ফকির এবার বলল, আদা সরাবেন না। বাড়ির সব জায়গায় রাখা হবে।

নিদিয়া এবার টেনে টেনে বলল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারছি না।

আদা সরায় ফেলাইলে কষ্ট আরো বাড়বে।

নিদিয়া এবার আদার বাটিতে লাথি মারল। তাতে বেশ দূরে সরে গেল বাটিটা। কিন্তু তার শরীরের জ্বালাযন্ত্রণা কমলো না। শেষে টেনে টেনে বলল, বাবা, খন্দকারের আত্মা আমার সাথে এই বাড়িতে এসেছে। আমি বুঝতে পারছি বাবা। তোমরা সবাই চেষ্টা করছ আমাকে বাঁচাতে, কিন্তু আমি আর পরছি না। বড়ো কষ্ট হচ্ছে। দয়া করে আদা সরিয়ে ফেলো। তোমাদের তাবিজ খুলে ফেলো।

কালু ফকির এবার আরো জোরে বলে উঠল, না, ঐ তাবিজও খুলা হবে না, আদাও সরানো হবে না।

তাহলে আমি এই বাড়িতে থাকব কীভাবে?

আমি থাকার ব্যবস্থা কইরা দিব। আগে বলেন, ঐ আত্মাডা কোথায়?

আমার শীররের ভেতরে।

আত্মাডা বাইর হইলেই ঐ আত্মারে মাইরা ফেলাইতে হবে।

নিজের ইচ্ছেমতো আত্মা বের হয়। আমার ইচ্ছেমতো নয়।

আপাতত আমি আপনেরে একটা আদার মালা দিতেছে। শুকনা আদা দিয়া তৈরি করা হইছে। আপনে গলায় পইরা থাকবেন। এই যে ন্যান। তাইলে ঐ আত্মাডা আপনের কোনো ক্ষতি করবার পারবে না।

নিদিয়া দাঁড়িয়ে থাকল। শাফায়েত আহমেদ এগিয়ে এসে মালাটা হাতে নিলেন। তারপর এগোতে থাকলেন নিদিয়ার দিকে। নিদিয়া ভয়ার্ত চোখে তাকাল মালার দিকে। হঠাৎই বলল, বাবা, আর এগোবে না।

কেন?

আমার শরীর কাঁপছে। শরীরের জ্বালাপোড়া আবার বাড়তে শুরু করেছে। তুমি এগোবে না, তুমি এগোবে না, ঐ আদা আমি সহ্য করতে পারছি না।

তারপরও এগোতে থাকলেন শাফায়েত আহমেদ।

একপর্যায়ে শরীরের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারল না নিদিয়া। সে তার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। শাফায়েত আহমেদ অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন কালু ফকিরের দিকে। কালু ফকির বলল, যেভাবেই হোক, ঐ আদার মালা নিদিয়া আপারে পরায় রাখতে হবে।

কেন?

এই মালা না পরাইলে আত্মা বড়ো ক্ষতি করবে তার।

কী ক্ষতি করবে?

আমি বলবার পারব না স্যার। তবে একজন মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড়ো যে ক্ষতি হয়, সেইরকম ক্ষতি হবার পারে।

শাফায়েত আহমেদ তাকালেন রুবিনার দিকে। তারপর বললেন, কিন্তু নিদিয়া রাজি হচ্ছে না।

তারে রাজি করান লাগবে।

কীভাবে?

রাজি না হইলে জোর কইরা মালা পরায় রাখা লাগবে। বিশেষ কইরা রাইতের বেলায়। ঐ সময় আত্মাডা জাইগা ওঠে।

অন্য কোনো উপায় বলুন।

আমি আর কিছু ভাইবা পাইতেছি না। তারে তো ছুরির কথাডা বলবার পারলাম না। কিছু শুনবার চাইল না। তারে দিয়াই হত্যা করান লাগবে ঐ আত্মারে।

নিদিয়া কি পারবে? আপনি পারবেন না?

সুযোগ থাকলে পারতাম। আমার সামনে ঐ আত্মা নিদিয়া আপার শরীর থাইকা বাইর হবে না স্যার। ছায়ামৃত্যুর আত্মাডা বড়ো চালাক, নিজের আপদবিপদ বুঝে।

আমাকে আরেকটু ভাবতে হবে।

দেরি করা ঠিক হবে না স্যার। কিছুক্ষণের মইধ্যেই সন্ধ্যা হবে।

শাফায়েত আহমেদ অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না এমন একটা ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি। পুলিশকে কি খবর দেবো?

দিবার পারেন। কিন্তু কোনো লাভ হবে না। পুলিশ ঐ আত্মার কথা বিশ্বাস করবে না, আমাগো ছুরিই একমাত্র ভরসা।

আপনি ঠিকই বলেছেন।

মালাডা তাড়াতাড়ি পরায় দেন, কথা না শুনলে জোর কইরা পরায় দিয়া লাগবে। এইডাই নিয়ম। তারপর একটা না একটা উপায় বাইর হবে। আমি যাই, বাড়ির চাইরপাশে আদার পানি রাইখা আসি। তাইলে আত্মাডা একটা জায়গার মইধ্যে বন্দি হইয়া যাবে। এই বাড়ির বাইরা যাবার পারবে না। অবশ্য আত্মা বেশি ক্ষমতাবান হইলে চইলা যাবে, ঠ্যাকায় রাখবার পারব না।

কোথায় যাবে?

তার নিজের বাড়িতে স্যার, মানে খন্দকার বাড়িতে।

তাহলে তো ভালোই হয়।

একলা যাবে না স্যার। যাওয়ার সময় নিদিয়া আপারে নিয়া যাবে। ঐ আত্মার চিন্তা-চেতনা আর ভাবনায় এহন খালি নিদিয়া আপা।

কথাগুলো বলে বের হয়ে গেল কালু ফকির। শাফায়েত আহমেদ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর মালা হাতে বেশ কয়েকবার টোকা দিলেন নিদিয়ার দরজায়। কিন্তু নিদিয়া দরজা খুলল না। শেষে তিনি নিজের রুমে গেলেন। তার পেছন পেছন এলো রুবিনা।

মালাটা টেবিলের ওপরে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শাফায়েত আহমেদ। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, রুবিনা, আমরা বোধহয় এত বড়ো বিপদে আগে পড়িনি।

রুবিনা কোনো কথা বললেন না। তিনি চেষ্টা করছেন তার চোখের পানি আটকাতে। কিন্তু পারছেন না।

নিদিয়া রাতের খাবার রুমেই খেয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এখন এসেছে বাথরুমে। কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছে সে। জ্বালাপোড়া করছে শরীর। মানসিক অস্থিরতা তো আছেই। এ মুহূর্তে তার বাবা-মাও কথা শুনছে না তার। হাত থেকে তাবিজ খুলে তার কাছে আসছে না। তারা হয়তো ঠিকই করছে। কারণ আত্মাকে ভয় পাচ্ছে। খন্দকারের আত্মা যে-কোনো সময় যে-কোনো ধরনের অঘটন ঘটাতে পারে। অবশ্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে তাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা তার জন্য শারীরিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যই বাথরুমে ঢুকেছে সে, সময় নিয়ে গোসল করবে।

গোসলশেষে নিদিয়া আয়নার সামনে বসল। শরীর তার এখনো জ্বালা পোড়া করছে। তবে কিছুটা কম। আয়নার দিকে তাকাতেই ফোন বেজে উঠল। ফোন করেছে রোমেল। রিসিভ করতে বলল, এখন কী অবস্থা নিদিয়া?

নিদিয়া সরাসরি বলল, ভালো না।

কেন?

শরীর খুব জ্বালাপোড়া করছে। তুমি ফোন করে ভালোই করেছ। আগামীকাল তোমার সময় হবে?

অফিস আছে। তবে তুমি বললে অবশ্যই আমি সময় বের করব।

আমি আসতে পারি।

কখন আসবে?

পরে জানাব। এখন রাখি।

এত তাড়াতাড়ি। আর কোনো কথা বলবে না।

না আমার ভালো লাগছে না।

রোমেল অবাক হয়ে বলল, আমার সাথে কথা বলতে তোমার ভালো লাগছে না?

না।

কেন?

এখন রাখি। ভালো থেকো।

লাইন কেটে দিলো নিদিয়া।

রোমেল আরো দুবার ফোন করল। কিন্তু ধরল না নিদিয়া। সে অনুমান করার চেষ্টা করছে কী ঘটতে পারে রাতে। খন্দকারের আত্মা নিশ্চয় আবার আবির্ভূত হবে। সেক্ষেত্রে সে চিৎকার করতে পারে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। আত্মা আবার তার শরীরে প্রবেশ করবে। যদি সে তার বাবা-মায়ের সাথে ঘুমায় তাহলে সে নিজেই স্থির থাকতে পারবে না। কারণ শরীর জ্বালাপোড়া করবে। তাদের শরীর থেকে আদার তাবিজও খোলা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এক্ষেত্রে তার জন্য ভালো হবে ঐ আত্মার সাথে কথা বলা। আত্মা কী চায় তা জেনে একটা সমাধানে আসা। কাজটা সে করতে পারবে কি না জানে না। তবে সিদ্ধান্ত নিল করার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ আত্মার সাথে আলোচনা।

নিদিয়া হঠাৎই অনুভব করল তার শরীরের জ্বালাযন্ত্রণা নেই। মুহূর্তেই যেন একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে সে। কেন এমন হলো যখন সে কারণ খুঁজছে তখনই চোখ পড়ল রুমের একেবারে কোনায়। আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে খন্দকারের ছায়াটা। মুখ দেখা যাচ্ছে না, মাথার ওপরের অংশটা ঢাকা। শরীর ধূসর রঙের কাপড়ে প্যাঁচানো। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে। যতই কাছে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে চোখ, মুখ। তার থেকে দুই ফুট দূরে এসে থামল খন্দকার। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তুমি কার সাথে কথা বলতেছিলা?

রোমেলের সাথে।

আমি তোমাকে নিষেধ করছি। শুনতেছ না ক্যান? তোমার জীবনে আমি ছাড়া আর কোনো পুরুষ থাকবে না।

নিদিয়া চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুলল। তারপর বলল, না থাকবে না।

তাইলে আগামীকাল তার সাথে আবার দেখা করবা ক্যান?

তাকে বলে দেবো যেন আমার সাথে আর কথা না বলে।

ফোনে বলে দিলেই হয়।

ঠিক আছে ফোনেই বলব।

তুমি আর কখনোই ওর কাছে যাবা না।

আচ্ছা যাব না, কিন্তু আপনি আমার কাছে কী চান?

খন্দকার আরো খানিকটা এগিয়ে এলো। তারপর টুলটা ঘুরিয়ে আয়নার দিকে করে দিলো। এখন নিদিয়া নিজেকে দেখতে পাচ্ছে আয়নায়। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে খন্দকার। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চেহারাটা হুবহু ছবির ফ্রেমের মতো। মুখে দাগ আছে।

খন্দকার টেনে টেনে বলল, আমি কী চাই, এ কথা আমি আগেও বলছি তোমারে।

কিন্তু আপনি আমাকে কীভাবে পাবেন, আপনি তো একটা মৃত মানুষের আত্মা।

আমি তোমারে ক্যামনে পাব, তা আমি ভালোমতোই জানি। শুধু মনে রাখবা আমারে সন্তুষ্ট করা হবে তোমার দায়িত্ব, আমারে সুখী করা হবে তোমার কাজ। পারবা না?

নিদিয়া কোনো কথা বলল না।

কথা বলতেছ না ক্যান?

কীভাবে পারব? আপনি আমার মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর কষ্টের সৃষ্টি করতেছেন।

আমি করি না। করে তোমার বাবা আর মা। তারা পুরা বাড়িতে আদা আর আদার পানি ছিটায় রাখছে। আদার গন্ধে এই বাড়ি যেন একটা নরক হইয়া আছে। আমি ঐ গন্ধ সহ্য করবার পারি না। এইজন্য আমার শরীরে যন্ত্রণা হয়। আমি যখন তোমার শরীরের মইধ্যে থাকি ঐ যন্ত্রণা তুমিও শরীরে অনুভব করো। এজন্য আমি চাই না এই বাড়িতে থাকতে। তোমারে নিয়া আমার বাড়িতে চইলা যাবার চাই। তা না হইলে...

তা না হলে কী?

এই বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি থাকব। আর কেউ না।

কী বলতে চাচ্ছেন আপনি? বাবা-মা, অন্যদের কী হবে?

এ বিষয় নিয়া তুমি ভাইবো না। শুধু আমারে নিয়া ভাববা। আমি ছাড়া তোমার চিন্তা-চেতনায় যেন আর কেউ না থাকে। শুধু আমি, শুধুই আমি।

কথাগুলো বলতে বলতে খন্দকার নিদিয়ার ঘাড়ে হাত রাখল। তারপর ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকল। নিদিয়া ঝাড়া দিয়ে হাত সরাতে

ভয়ানকভাবে রেগে গেল খন্দকার। সে চুল ধরে টেনে দাঁড় করালো নিদিয়াকে। তারপর কষে একটা চড় লাগাল। সামলাতে না পেরে একেবারে বিছানার ওপর গিয়ে পড়ল নিদিয়া। ওঠার আগেই এগিয়ে গেল খন্দকার। একহাতে গলা চেপে ধরল সে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, খবরদার আমার সাথে আর কোনোদিন রাগ দেখাবি না। তাইলে তোর অবস্থা হবে লায়লার মতো। লায়লারে আমি বস্তি থাইকা তুইলা আনছিলাম। সুন্দরী বইলা বিয়া করছিলাম তারে। সে আমার সাথে বেইমানি করছে। আরেকজনরে ভালোবাসত। আমারে বিয়া করছিল খালি টাকাপয়সার জন্য। আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়িতে নিয়া আসত তার প্রেমিকরে। আমি লায়লার প্রেমিকরে খুন করছি। সাক্ষী যাতে না থাকে সেইজন্য নিজের পিস্তল দিয়া বাড়ির দারোয়ানরেও খুন করছিলাম। পরে খুন করছি লায়লারেও। মৃত্যুর আগে লায়লা আমার কছে ক্ষমা চায়। আমি তারে বুকে টাইনা নিছিলাম। কিন্তু আমার ভালোবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়া সে আমারেই আমার পিস্তল দিয়া গুলি করে। তয় গুলিটা আমার পায়ে লাগায় আমি বাঁইচা যাই। তারপর লায়লার ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হইছে। বড়ো কষ্ট দিয়া তারে আমি হত্যা করছিলাম। পরে বুঝবার পারছিলাম কত বড়ো ভুল আমি করছি। আমার ভালোবাসার মানুষরে আমি নিজে হত্যা করছি। লায়লারে হারানোর কষ্টটা আমি সহ্য করবার পারতেছিলাম না। শ্যাষে নিজেই ফাঁস দিয়া আত্মহত্যা করি। কিন্তু আমার ছায়ামৃত্যু হওয়ায় আমি বাঁইচা আছি। কপাল ভালো তোর মইধ্যে আমি আমার লায়লারে খুঁইজা পাইছি। তুই আমার সাথে আর প্রতারণা করবি না, খবরদার, কোনোদিনও না। আমি তোরে ভালোবাসতে চাই, সারাজীবন ভালোবাসতে চাই। তোর ভালোবাসার মইধ্যে আমি বাঁইচা থাকবার চাই।

কথাগুলো বলতে বলতে নিদিয়ার মুখের ওপর মুখ নিয়ে এলো খন্দকার।

নিদিয়া ধাক্কা দিয়ে খন্দকারকে সরাতে চেষ্টা করেও পারল না। খন্দকারের বলপ্রয়োগের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

নিদিয়া বুঝতে পারল বিপদ, মহাবিপদ। সে বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার করে উঠল।

এমন সময় জানালা দিয়ে তীব্র আদার গন্ধ এসে ঢুকল ভেতরে।

আর তাতে শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল খন্দকার। তারপরই কাঁপতে শুরু করল তার শরীর। মনে হচ্ছে খন্দকারের শরীরে ভয়ানক কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে। অবশ্য পরের মুহূর্তেই দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল নিদিয়াকে, নিদিয়া বহুচেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না নিজেকে। শুধু দেখল, ধীরে ধীরে তার শরীরের মধ্যে হারিয়ে গেল খন্দকার। যন্ত্রণা এখন শুরু হলো তার শরীরে। সহ্য করা যাচ্ছে না। বুঝতে পারল খন্দকারের যন্ত্রণা তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল বাথরুমে গিয়ে আবার গোসল করবে। কিন্তু চেষ্টা করেও সে বাথরুমের দিকে যেতে পারছে না। সে যাচ্ছে বাইরে বের হওয়ার দরজার দিকে। কেউ যেন তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। খুবই ভয় পেয়ে গেল নিদিয়া। শেষে আবার চিৎকার করার চেষ্টা করল। সে বিস্মিত হলো অনুধাবন করে যে তার গলা দিয়ে পুরুষের মতো স্বর বের হচ্ছে। এতে তার ভয় আরো বাড়ল।

নিদিয়া না চাইলেও দরজা পর্যন্ত আসতে বাধ্য হলো। তারপর দরজাও খুলল। দেখল সামনে তার বাবা, মা, কালু ফকির আর কুলসুম খালা দাঁড়িয়ে আছে। কালু ফকিরের হাতে আদার মালা। এগিয়ে আসছে সামনের দিকে।

পাদুটো যেন নিজে থেকেই পিছিয়ে যেতে লাগল। অবাক হলো নিদিয়া। তারপর হঠাৎই তার গলা দিয়ে পুরুষালি কণ্ঠের শব্দ বের হয়ে এলো, ঐ বদমাইশ, সইরা যা আমার সামনে থাইকা।

নিদিয়ার কণ্ঠ শুনে সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেলেন রুবিনা। শাফায়েত আহমেদ তাকে ধরে বেডরুমে নিয়ে গেলেন। নিদিয়ার শরীরের ভেতরে তখন যেন আগুন জ্বলছে। তীব্র যন্ত্রণায় সেও নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারল না। ধপ করে নিচে পড়ে গেল। তারপরই জ্ঞান হারাল।

পরেরদিন সকাল দশটা।

নিদিয়া এসেছে রোমেলের অফিসে। রোমেল যেন প্রস্তুতই ছিল, বের হয়ে এলো অফিস থেকে। নিদিয়ার চেহারা দেখে তো সে অবাক, খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে, চোখের নিচে কালি পড়তে শুরু করেছে। বলল, এ কী অবস্থা তোমার?

আমি ভালো নেই। গতরাতে ঘুমাতে পারিনি। অজ্ঞান হয়ে ছিলাম মাঝরাত পর্যন্ত।

আ...আমি তো তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

অতকিছু এখন বোঝা দরকার নেই। আমি যা বলছি তাই শোনো।

হ্যাঁ বলো।

আ...আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

এরকম একটা কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না রোমেল। বলল, অবশ্যই বিয়ে করব। আমরা তো এরকমই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বিয়েটা হবে আজ।

কী বলছ!

হ্যাঁ।

তোমার কি মাথা ঠিক আছে?

আমার মাথা ঠিকই আছে। আমি খুব ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো বলছি । তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে। হয়তো আজই আমাদের শেষ দিন। খন্দকারের ছায়া বড়ো খারাপ। সে আমাকে পেতে চাইছে, আমার শরীর, মন সব পেতে চাইছে। কিন্তু কিছুই আমি তাকে দেবো না, যা আছে সবই তোমার। তোমাকে আমি ভালোবাসি, প্রচণ্ড ভালোবাসি। তাই গতকালই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তোমাকে বিয়ে করব, এবং তা আজই।

কিন্তু তোমার পরিবার, আমার পরিবার। আর ঢাকায় আমার

তো...

পরিবার নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমার পরিবার আমি সামলাব। তুমি তোমার পরিবার। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা এখন গোপনে বিয়ে করব। তারপর তোমার বাসায় চলে যাব।

আ...আ...মার বাসায়।

হ্যাঁ। আজ দিনটা ওখানেই থাকব।

রোমেল দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, তুমি কী বলছ? তুমি কি বুঝতে পারছ?

আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি, আমি তোমাকে বিয়ে করব এবং আজই। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তোমার বাসায় থাকব। তারপর চলে আসব আমাদের বাসায়। এখন সিদ্ধান্ত তোমার, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো তাহলে কাজি অফিসে চলো। আর যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও, হয়তো আমি তোমার কাছে নাও ফিরে আসতে পারি। আমাকে হয়তো জোর করে ঐ শয়তানটা তার কাছে নিয়ে নেবে।

খন্দকার নামের কেউ কি সত্যি আছে?

নিদিয়া এবার তাকাল রোমেলের চোখে। তারপর টেনে টেনে বলল, বিয়ে একজন মেয়ের সারাজীবনের স্বপ্ন। আমার ইচ্ছে ছিল আমাদের বিয়েটা জাঁকজমকপূর্ণ হবে। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়, কারণ হাতে সময় নেই। আর খন্দকারের কথা বলছ, অবশ্যই ওর আত্মা আছে। আমাদের বাড়ির সবাই এখন ঐ আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে। আত্মাটা বড়ো ভয়ংকর। মাগরিবের আজানের পর থেকে ফজরের আজানের আগপর্যন্ত সক্রিয় থাকে। সকল কথা শুনতে পায় ঐ সময়। এখন অবশ্য তোমার আমার কথা বা পরিকল্পনা শুনতে, জানতে পারছে না। কারণ সময়টা দিন। তাই আজ সন্ধ্যার আগেই আমি তোমার হয়ে যেতে চাই, শুধুই তোমার। আজ দিনটাকে আমি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না রোমেল।

নিদিয়ার চোখদুটো ছলছল করে উঠল।

তুমি কি তোমার পরিবারের কাউকে জানাবে না?

না।

আমার পাশ থেকে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তোমরা অনেক বড়োলোক। তোমাদের পরিবার থেকে আমাকে মেনে নেবে কি না, এই বিষয়টা আরেকবার ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

আমার বাবা-মা তাদের একমাত্র মেয়ের জন্য ভালো একজন মানুষ চায়, অর্থ প্রতিপত্তি চায় না। তুমি সেই ভালোমানুষ, আমার পছন্দের মানুষ, আমার ভালোবাসার মানুষ। এজন্য বলছি কোনো চিন্তা করবে না, আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, তোমারই হয়ে থাকতে চাই। দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না। ফিরিয়ে দিলে আমি সত্যি হয়তো আজকের মতো করে তোমার কাছে আর আসতে পারব না।

তুমি কি সত্যি আমার বাসায় উঠবে? অনেকবার বলার পরও আগে কখনো কিন্তু যাওনি। আমার বাসা অতটা ভালো না।

আগে যাইনি সত্য, আজ যাব। যাব আমার নিজের বাসা মনে করে। আর ঐ বাসায় তুমি থাকলেই চলবে, আর কিছুর দরকার নেই।

তুমি বড়ো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছ নিদিয়া।

পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে। আমি পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে হলেও তোমার ভালোবাসার মর্যাদা দিতে চাই, আমাদের ভালোবাসার পূর্ণতা চাই।

আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে বাসায় যাব। আমাকে কি একটু প্রস্তুতির সময় দেবে না?

না, আমার কিছুর দরকার নেই।

আমাদের সাক্ষী তো লাগবে।

রাস্তা থেকে না হয় দুই-একজনকে নিয়ে নেব। আর কাজি অফিসে সব সময় সাক্ষী থাকে। কোনো সমস্যা হবে না।

রোমেল একটু সময় নিল। তারপর বলল, তুমি কি সত্যি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ?

তোমার কোনো সন্দেহ আছে?

জীবনের সবচেয়ে বড়ো সিদ্ধান্তটা আমরা নিতে যাচ্ছি।

আমি জানি, আমার সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। বিয়ে আমাদের করতে হবে এবং আজই। তা না হলে...

তা না হলে কী?

আবারও বলছি, হয়তো তুমি আমাকে হারাবে, আমি আর তোমার সামনে এই মুখ নিয়ে আসতে পারব না।

আমার কী মনে হচ্ছে জানো, তুমি একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে আছো। ভালো হতো যদি সবকিছু আমি জানতে পারতাম আর

কয়েকটা দিন সময় পেতাম। তবে আমি জানার চেষ্টা করব না। তোমাকে আমি যেমন বিশ্বাস করি, তেমনই ভালোবাসি। এই বিশ্বাস এবং ভালোবাসার কারণেই আমরা আজ বিয়ে করব।

নিদিয়া টলটলে চোখে তাকাল রোমেলের দিকে।

রোমেল মিষ্টি করে হেসে বলল, আমরা কাজি অফিসে যাব ঠিকই। তার আগে অন্তত একটা শাড়ি আমি তোমাকে কিনে দেবো।

তাহলে আমি তোমাকে পাঞ্জাবি কিনে দেবো।

ঠিক আছে নিদিয়া।

এরপর দুজনে মার্কেটে এসে শাড়ি পাঞ্জাবি কিনল। তারপর গেল কাজি অফিসে। আধঘণ্টার মতো সময় লাগল বিয়ের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে। মিষ্টি বিতরণের পর তারা যখন রওনা দিলো তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। গন্তব্য রোমেলের বাসা।

রোমেলের বাসায় দুজন জীবনের সবচেয়ে সুন্দর এবং উপভোগ্য সময় কাটাল। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা। ঘুম থেকে আগে উঠে গোসল করল নিদিয়া। তারপর শাড়ি পালটে বাসার থেকে নিয়ে আসা থ্রিপিস পরল। চা নিয়ে যখন সে এলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রোমেলের ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে নিদিয়া বলল, আমাকে তুমি তাড়াতাড়ি বাসায় পৌঁছে দেবে।

তুমি উঠেছ আমাকে জানাবে না? আর এত তাড়াহুড়া করছ কেন?

সন্ধ্যা হয়ে এলো যে। মা-বাবাও চিন্তা করবে।

তারা তো তোমাকে ফোন করেনি।

হয়তো করেছে। আমি ফোনটা বন্ধ করে রেখেছি। আমি চাইনি আমাদের সুন্দর সময়ে কেউ বিরক্তির কারণ হোক।

ভালোই করেছ।

চা শেষ করো, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

আজ না হয় থেকে যাও।

না থাকব না। আজানের সময় হয়ে এসেছে।

তাতে কী হয়েছে?

শয়তান খন্দকার আবার জেগে না ওঠে। আমি খুব ভয় পাই ওকে। জানি না কী হবে? যেভাবেই হোক ওই আত্মাটাকে তাড়াতে হবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রোমেল বলল, তুমি খন্দকারের আত্মাকে এখনো ভুলতে পারোনি?

আমার জায়গায় হলে তুমিও ভুলতে পারতে না। তবে সান্ত্বনা এই যে আমি তোমার হতে পেরেছি, আমার ভালোবাসার মর্যাদা আমি রাখতে পেরেছি। আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি তুমি।

রোমেল মিষ্টি হেসে বলল, তুমি এমনভাবে বলছ, আমি বিশ্বাস করছি সত্যি আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান পুরুষ। যাইহোক,

আমি এখনই তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব না। রাতে দুজন একসাথে বাইরে কোথাও খাব। তারপর তোমাকে পৌঁছে দেবো।

না না, অতটা দেরি করা ঠিক হবে না। আমি তাড়াতাড়ি যেতে চাই, পারলে এখনই।

ঠিক আছে, তুমি যা বলবে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

রোমেল বাথরুমে প্রবেশ করলে নিদিয়া মাথার চুল আঁচড়ে নিল। তারপর এলো জানালার কাছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। আজান দিতে কতক্ষণ বাকি যখন ভাবছে ঠিক তখনই আজানের ধ্বনি কানে এলো তার। মুহূর্তেই আত্মা কেঁপে উঠল নিদিয়ার। বুঝতে পারল ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে।

নিদিয়া তার ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিতেই কেঁপে উঠল শরীরটা। তারপর কানের কাছে খন্দকারের আত্মাকে বলতে শুনল, তুমি কোথায় আইছ নিদিয়া?

নিদিয়া ঢোক গেলার চেষ্টা করেও পারল না। একেবারে স্থবির হয়ে গেল।

এই জায়গাডা কোথায়?

আবার প্রশ্ন করল খন্দকার।

একটা বাসা।

তা তো দেখবার পাইতেছি। কিন্তু কার বাসা?

আ...আপনি জেনে কী করবেন?

আমার সবকিছু জানার দরকার।

আমার ব্যক্তিগত বিষয় আপনি জানবেন কেন?

তোমার ব্যক্তিগত বলতে কিছু নাই নিদিয়া। তোমার বুঝা লাগবে তোমার সবকিছুই আমার। আর আমার কাছে তুমি কিছু লুকাবার পারবা না। বলো, কার বাসায় আইছ?

আমি বলব না।

তোমারে বলতেই হবে। আমার কী মনে হইতেছে জানো, তুমি আমার অবাধ্য হইছো।

নিদিয়া ভাবল সে কিছু বলবে না, একা একা বের হয়ে যাবে বাসা থেকে। কিন্তু দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো রোমেল। নিদিয়া সাথে সাথে বলল, রোমেল... রোমেল...ভেতরে যাও।

কী হয়েছে?

খন্দকার...।

কী হয়েছে খন্দকারের?

জেগে উঠেছে। আমাকে এখনই যেতে হবে।

কই খন্দকার?

তুমি দেখতে পাবে না। আমার মাঝে আছে। ও আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তখন আমি আর নিজের মতো করে তোমার সাথে কথা বলতে পারব না। আমি...

হ্যাঁ বলো...

আ...

কী হলো নিদিয়া?

আ...আ...আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আ...আমাকে...আমি...পারছি না...আ...আমি।

রোমেল এগিয়ে এসে ধরল নিদিয়াকে। নিদিয়ার হাত-পা শক্ত হয়ে আসছে। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না। দেখে বোঝা যাচ্ছে বড়ো কষ্ট হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে তৃতীয় কারো সাথে যুদ্ধ করছে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই ভয়ংকর কাজটা করল সে। দুই হাতে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিলো রোমেলকে।

ছিটকে পেছনের দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো রোমেল। নিদিয়ার শরীরে এতটা শক্তি চিন্তাই করতে পারেনি। এদিকে উঠে বসেছে নিদিয়া। চুলগুলো তার এলোমেলো। চোখদুটো যেন ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তু...তুই রোমেল। আমার নিদিয়ারে তুই নিয়া গেছস। তাই না?

রোমেল অবাক হয়ে বলল, এসব কী বলছ নিদিয়া? আ...আর তোমার কণ্ঠ পুরুষের মতো কেন?

আ... আমি খন্দকার। তোরে আজ আমি মাইরা ফেলাব।

খ...খন্দকার।

হুঁ, আমি খন্দকার। তোর যম। আমি তোরে ছাড়ব না।

চিৎকার করে কথাগুলো বলল খন্দকার। তারপর নিদিয়ারূপী খন্দকার ছুটে আসতে লাগল রোমেলের দিকে। রোমেল ঠ্যাকাতে চেষ্টা করেও পারল না। ভয়ানক একটা ঘুসি খেলো চোয়াল বরাবর। ঠোঁট কেটে তার রক্ত বের হয়ে এলো।

এবার নারীকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নিদিয়া, রোমেল তুমি পালাও, পালাও। আমি দানবটার সাথে পারছি না। আমি...

কথা শেষ করতে পারল না নিদিয়া। আবার পুরুষের কণ্ঠ বের

হয়ে এলো তার গলা দিয়ে, না, তোরে আমি পালাবার দিব না। তুই আমার নিদিয়ার সর্বনাশ করছস। আমি খন্দকার তোরে ছাড়ব না।

কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে এলো নিদিয়ারূপী খন্দকার। তারপর তলপেটে ভয়ানক এক ঘুসি হাঁকাল। রোমেল আর পারল না, নিচে পড়ে গেল। তার চোখের সামনে সবকিছু এখন ঘুরছে, ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরছে।

এদিকে বাসার মধ্যে চিৎকার আর ধুপধাপ শব্দ শুনে দারোয়ান ওপরে উঠে এসেছে। কী হয়েছে দেখতে উঁকি দিতে দেখল, যে মেয়েটি রোমেলের সাথে এসেছিল সে একটার পর একটা ঘুসি হাঁকাচ্ছে রোমেলের পেটে। ভয়ে সে নিজেও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, চিৎকার করে উঠল 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে। এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল সামনে। তার সাথে চোখাচোখি হতে মেয়েটি অবশ্য উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতের ব্যাগটি তুলে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেল বাসা থেকে।

নিদিয়া বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু তার রুমে সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। সমস্ত শরীর যেন জ্বলছে। তার থেকে বড়ো কথা, মানসিক অশান্তি। কী ভয়ানক কাজটাই না সে করেছে! করতে বাধ্য হয়েছে। রোমেল, যে কি না তার স্বামী, আজ বিয়ে করেছে, তার শরীরে হাত তুলেছে। একজন নারীর জন্য এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে। রোমেল তার সম্পর্কে কী ভাবছে, ভাবতেই তার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কাজটা যে সে নিজে করেনি, কীভাবে বোঝাবে রোমেলকে। রোমেল বিশ্বাসই করতে চায় না যে তার ওপর খন্দকারের আত্মা ভর করেছে। চাইলেও সে ঐ আত্মার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। বরং রোমেলকে ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে আজ সে তাকে বিয়ে করেছে, তার সাথে একান্তে সময় কাটিয়েছে।

অস্থির হয়ে আছে নিদিয়া। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি গড়িয়ে পড়েছে। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারছে না। এজন্য বাসায় প্রবেশের সময় কারো সাথে কোনো কথাও বলেনি। তার মা অনেকবার জানতে চেয়েছে কোথায় ছিল সে। কোনো উত্তর দেয়নি। কী উত্তর দেবে? যদি বলে সে আজ বিয়ে করেছে তার মা-বাবা দুজনেই বিস্মিত হবে। আর যদি জানে, আজ নতুন স্বামীর শরীরে হাত তুলেছে, তাকে মেরেছে, তাহলে তাদের বিস্ময়ের সীমা থাকবে না।

নিদিয়া যখন এরকম ভাবছে তখন 'নিদিয়া নিদিয়া' বলে হঠাৎই ডেকে উঠল খন্দকার।

উত্তর দিলো না নিদিয়া।

আবার ডাকল খন্দকার, নিদিয়া, নিদিয়া।

নিদিয়া চুপ।

আমার ওপর রাগ কইরা তুমি থাকবার পারবা না। কারণ আমি

তোমার শরীরের ভেতরে, তোমারে নিয়ন্ত্রণ করতেছি। তোমার বুঝতে হবে, আমি তোমারে পছন্দ করি। যে অন্যায় তুমি করছ আইজ, তা ক্ষমার অযোগ্য। তারপরও তোমারে আমি ক্ষমা কইরা দিলাম। তুমি মনে রাখবা তুমি শুধুই আমার। এই কথা অনেকবার তোমারে বলেছি, কিন্তু তুমি শুনতেছ না। অনেকটা লায়লার মতো। লায়লার একজনের সাথে প্রেম আছিল। কিন্তু তার বুঝা উচিত আছিল আমার সাথে বিয়ে হইয়া যাওয়ার পর আমিই তার সব, পুরাতন প্রেমিকের সাথে তার সময় কাটানো উচিত হয় নাই। আমি তারে শাসন করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারি নাই। তার সাহস এতটাই বাড়ছিল যে আমার বাড়িতে পর্যন্ত ঐ প্রেমিকরে নিয়া আসত। তখন আর আমি সহ্য করবার পারি নাই। আমার সহ্যের সীমা সে অতিক্রম করছিল। তুমিও আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করতেছ। এইডা ভালো লক্ষণ না। আর, একই কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। তোমার বুঝা উচিত, আমি তোমারে পাগলের মতো ভালোবাসি। আমার ভালোবাসার মূল্য তোমারে দিতেই হবে। তা না হলে তুমি শান্তি পাবে না। আরেকটা কথা, আমার সুবিধা, অসুবিধা, ভালোলাগাও তোমার দেখা লাগবে। সত্য কথা বলতে কী, এই বাড়িতে আমার ভালো লাগতেছে না। আমি স্বস্তিতে এইখানে থাকবার পারতেছি না। তাই সিদ্ধান্ত নিছি আমার বাড়িতে চইলা যাব, তুমি কি যাবা?

নিদিয়া এবার জোরে বলে উঠল, না।

কেন?

আমি আপনার বাড়িতে কোনোদিনও যাব না।

আমার বাড়িই তোমার বাড়ি। তোমার বুঝতে হবে। তুমি আমার স্ত্রী।

দুজন মানুষের চেহারা এক হলে তারা একই মানুষের স্ত্রী হতে পারে না। আপনি একটা মৃত আত্মা।

তুমি আমারে আঘাত কইরা কথা বলতেছ।

আপনিও আমাকে আঘাত করছেন। কষ্ট দিচ্ছেন। রোমেলের শরীরে আমাকে দিয়ে হাত তুলিয়েছেন। আমি তার সামনে মুখ দেখাব কীভাবে?

খন্দকার এবার ভয়ানক রেগে উঠে বলল, তু...তুই আবার রোমেলের কথা বলতেছিস!

অবশ্যই বলব, হাজারবার বলব।

তুই কি বুঝতে পারছিস না যে তুই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস!

না, আমি মোটেও সীমা ছাড়াচ্ছি না, আমি রোমেলকে ভালোবাসি। এই সত্যটা আপনাকে বোঝাতে চাই, আপনি পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে হলেও আমার মন থেকে রোমেলকে মুছতে পারবেন না। আমি রোমেলকে ভালোবাসি, ভালোবাসি।

কথাগুলো বলার পর হঠাৎই যেন নিজেকে হালকা মনে হতে লাগল নিদিয়ার। মনে হতে লাগল তার অপরাধবোধ এখন অনেকটাই কমে এসেছে। কারণ চিরসত্য কথাটা সে বলতে পেরেছে।

এদিকে তার থেকে ঠিক তিন ফুট দূরে এখন খন্দকারের ছায়াটা আবির্ভূত হয়েছে। নিদিয়া বুঝতে পারল তার শরীর থেকে বের হয়েছে খন্দকার। সে কিছু বলার আগেই খন্দকার কষে একটা চড় দিলো তার গালে।

এরকম আচরণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিল সে। দ্বিতীয় চড়টা যখন সে খেলো, তখন চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল বিছানায়। অবশ্য চিৎকারও করে উঠল, আমাকে মারছেন কেন, আমাকে মারছেন কেন?

খন্দকার এবার টেনে তুলল নিদিয়াকে। তারপর চুল ধরে পরপর কতকগুলো কিল দিলো পিঠের ওপর। তীব্র ব্যথায় হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল নিদিয়া। তার চিৎকারে অবশ্য ততক্ষণে ভেতরে প্রবেশ করেছেন রুবিনা। তার পেছন পেছন এলেন শাফায়েত আহমেদ। তারা যা দেখলেন তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। নিচে মেঝেতে পড়ে আছে নিদিয়া গোঙাচ্ছে। তার মুখের কোনা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

রুবিনা কাছে গিয়ে কী হয়েছে জানতে চাইলে নিদিয়া পুরুষালি কণ্ঠে বলল, এই ঘর থাইকা আদা সরায় ফেল, নইলে এখনই মাইরা ফেলাব নিদিয়ারে ।

নিদিয়ার কণ্ঠে আবার পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে ঘাবড়ে গেলেন শাফায়েত আহমেদ আর রুবিনা। কালু ফকিরও এসে পৌঁছেছে।

পেছনে দরজার কাছে ছিল। তার হাতে ছুরি। বলল, কিছুই করবার পারবি না তুই।

পারব, আমি সব পারব।

উলটা আমি তোরে মাইরা ফেলাব আইজ।

মাথা নেড়ে নেড়ে পুরুষালি কণ্ঠে নিদিয়ারূপী খন্দকার বলল, পারবি না, পারবি না, আমারে তুই মারবার পারবি না। আমারে মারলে নিদিয়ারেও মারা লাগবে।

শাফায়েত আহমেদ পাশ থেকে বললেন, ফকির বাবা, আপনি মনে হয় আদা সরায় ফেলেন।

না ঠিক হবে না।

আমার মেয়ের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না।

করতে হবে। নাইলে ঐ শয়তানডারে মারা যাবে না।

নিদিয়া মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে।

কালু ফকির বুকের মধ্যে আটকে রাখা দমটা ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। গোপনে রাখা আদা সরায় নিতেছে। তয় খন্দকাররে ছাড়া যাবে না। বড়ো বজ্জাত আত্মা, বড়ো বজ্জাত।

কালু ফকির রুমের চারপাশে যে আদা রেখেছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলল। তার উদ্দেশ্য ছিল আদার তীব্র গন্ধে নিদিয়ার শরীরের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসবে খন্দকারের আত্মা। তখন ছুরি ঢুকিয়ে আত্মাকে হত্যা করবে। আত্মা বের হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু উলটো অত্যাচার শুরু করেছে নিদিয়ার ওপর, এজন্য পারল না সে। তারপর এখন আবার নিদিয়ার শরীরের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। খন্দকারের আত্মাকে হত্যার কাজটি যে বড়ো কঠিন হবে বুঝতে পারছে সে।

কালু ফকির বের হয়ে গেলে রুবিনা একটা বাটিতে হালকা গরম পানি নিয়ে এলেন। নিদিয়াকে বিছানায় শুইয় দিয়ে রক্তাক্ত মুখটা মুছে দিলেন তিনি। নিদিয়া তার নিজস্ব কণ্ঠস্বরে শুধু বলল, মা, বড়ো কষ্টে আছি মা! মা বড়ো কষ্টে!

কথাগুলো বলার সময় নিদিয়ার চোখ দিযে টপটপ করে পানি বের হয়ে এলো। রুবিনা আর তার পাশে দাঁড়ানো শাফায়েত আহমেদ কেউই নিদিয়ার কথা শুনে নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

রাত সাড়ে দশটা।

নিদিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। রুবিনা উঠে ড্রয়িংরুমে এলেন। শাফায়েত আহমেদ আগেই এসেছেন। রুবিনা বসতে বললেন, আমি কালু ফকিরকে আসতে বলেছি।

কেন?

এখন আমরা কী করব, সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। আধুনিক এই যুগে আমরা কী অশরীরীয় আত্মার পাল্লায় পড়লাম। কেউ কি বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?

হ্যাঁ, এটাই সমস্যা। যা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাই ঘটছে আমাদের জীবনে। কোথায় ছিল আজ সারাদিন, কিছু কি বলেছে?

না, আর কথা হয়নি। তুমি চলে আসার পরপরই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শাফায়েত আহমেদ ঠোঁট কামড়ে বললেন, এইটা আরেক চিন্তা। এত বড়ো মেয়ে, সারাদিন কোথায় থাকল জানতে পারলাম না। মোবাইলটা এখনো বন্ধ করে রেখেছে?

হ্যাঁ, ওর বান্ধবীরাও জানে না কোথায় ছিল নিদিয়া। দুজনকে ফোন করেছিলাম। কেউ কিছু বলতে পারেনি।

তার মানে নিদিয়া যেখানে গিয়েছিল, সেই জায়গার কথা সে ইচ্ছে করে গোপন রাখছে।

রুবিনা এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার একটা বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে।

কোন বিষয়ে?

রুবিনা কি একা গিয়েছিল, নাকি তাকে ভুলিয়েভালিয়ে কেউ নিয়ে গেছে। মানে আমি বলতে চাচ্ছি খন্দকারের ঐ আত্মার কথা।

মনে হয় না। আত্মাটা নাকি শুধু রাতেই সক্রিয় হয়। দিনে নিদিয়া

দেখলেও দেখতে পারে, তবে দিনে আত্মার কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। কাউকে আঘাতও করতে পারবে না, কারো ক্ষতিও করতে পারবে না। এজন্য দিনে আমরা ঝুঁকিমুক্ত। কালু ফকির এরকমই বলেছে। আত্মাটা যা কিছু করবে সবই সন্ধ্যার পর। একজন মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে যেমন হয়, আত্মাটা নাকি দিনে ঐরকম ঘুমন্ত থাকে। শুধু যার শরীরে ভর করবে, সে দেখলেও দেখতে পারবে আত্মাকে।

আমরা কেউ তো দেখলাম না।

শাফায়েত আহমেদ বললেন, না দেখাই ভালো। ঐ ভয়ংকর আত্মা দেখে আমরা আবার বেশি ঘাবড়ে না যাই। নিদিয়ার মুখে আত্মার পুরুষালি কণ্ঠ আমি সহ্য করতে পারি না। যাইহোক, আমি ভাবছি নিদিয়াকে আগামীকাল একজন মানসিক রোগবিশেষজ্ঞকে দেখাব।

তাতে কি কোনো কাজ হবে?

হবে না, কেন যেন মনের মধ্যে একরকম সন্দেহ কাজ করছে। সম্পূর্ণ বিষয়টা মানসিকও হতে পারে।

তাই যদি হয়, তাহলে পুরুষের কণ্ঠ আসে কীভাবে? আর আজ রাতে কে মারল নিদিয়াকে। ঠোঁট কেটে একেবারে রক্ত বের হয়ে এসেছে।

তা অবশ্য ঠিক। সত্যি মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব।

এমন সময় নিচের দারোয়ান এসে জানাল, পুলিশ এসেছে স্যার।

শাফায়েত আহমেদ অবাক হলেন, হঠাৎ পুলিশ আসবে কেন? তিনি নিজেই বাইরে এলেন। একটা প্যাট্রল গাড়িতে একজন সাব-ইন্সপেক্টর আর দুজন কনস্টেবল এসেছে। সাব-ইন্সপেক্টর বিনয়ের সাথে বলল, স্যার, কিছু মনে করবেন না, ঘণ্টাখানেক আগে আপনাদের বাসায় কোনো মেয়ের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। তাকে সম্ভবত কেউ মারছিল। এ বিষয়ে আশেপাশের কোনো একটা বাসা থেকে আমাদের ফোন করেছে। তখন থানা থেকে একজন কনস্টেবল পাঠানো হয়েছিল। সে জানিয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু বিষয়টা নারীঘটিত, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার আমাকে পাঠানো হয়েছে।

কে ফোন করেছে?

পরিচয় জানানো যাবে না স্যার।

না, আমাদের এখানে কোনো সমস্যা নেই।

ও আচ্ছা। স্যার, আপনিই তো বাড়ির মালিক।

হ্যাঁ।

স্যার যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা কি বলবেন। আসলে আমাদের রেকর্ডে রাখা প্রয়োজন যে আপনার সাথে কথা বলে গিয়েছি। পরে যদি কিছু ঘটে তাহলে অন্তত বলতে পারব।

শাফায়েত আহমেদ নিজের নাম বললেন। একটা ভিজিটিং কার্ডও দিলেন। পুলিশ চলে গেলে দারোয়ানের কাছে জানতে চাইলেন, সত্যি কোনো কনস্টেবল এসেছিল কি না? দারোয়ান ওপরে-নিচে সম্মতিসূচক মাথা দোলাল।

মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল শাফায়েত আহমেদের। বুঝতে পারলেন নানারকম জটিলতায় পড়তে যাচ্ছেন। তার স্ত্রী রুবিনাও পেছনে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনেছেন। মানসিকভাবে তিনিও যে বিপর্যস্ত স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তিনি।

কালু ফকির আসায় তিনজন মুখোমুখি বসলেন। শাফায়েত আহমেদ বললেন, এখন আমাদের করণীয় কী বলুন?

কালু ফকির ধাতব ছুরিটা দেখিয়ে বলল, আগামীকাল দিনের বেলায় নিদিয়া আপার সাথে কথা বলা লাগবে। তারে বুঝাইতে হবে যে এই ছুরি দিয়াই খন্দকারের আত্মারে হত্যা করতে হবে। আর এই কাজটা তারই করা লাগবে।

ও কি পারবে?

তারে সাহস দিতে হবে। তয় অন্যকিছু হইলে মুশকিল হইয়া যাবে।

অন্যকিছু মানে?

আত্মাডা আইজ আপারে মাইরপিট করছে। লক্ষণ ভালা না। নিদিয়া আপা যদি কথা না শোনে তার ওপর আরো অত্যাচার করবার পারে। এমনও হইতে পারে যে এই বাড়ি থাইকা অন্য কোথাও নিয়া গেল।

রুবিনা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, কী বলছেন আপনি?

এই কথা আপনেরে আগেও বলছি যে আত্মাডা এই বাড়িতে থাকবার চাইবে না। তার নিজের বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

এইজন্য বলতেছিলাম...

কী?

কিছু মনে করবেন না। নিদিয়া আপারে শিকল দিয়া বাইন্দা রাখলে ভালো হয়।

শাফায়েত আহমেদ বেশ চড়া গলায় বললেন, আপনার কি মাথা খারাপ!

না স্যার। মাথা ঠিকই আছে। তয়, আর কোনো উপায় নাই। যা বলতেছি চিন্তাভাবনা কইরা বলতেছি। আমিও চাই নিদিয়া আপা তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া উঠুক। কিন্তু সেই সুযোগ তো আসতে হবে। আর সুযোগ আসা পর্যন্ত আমাগো নিরাপদ থাকা লাগবে। আপনেগো কিছু হইলে বড়ো বিপদ হবে। আত্মাডা কোন সময় কার ক্ষতি করে বুঝা মুশকিল। আর ভুলেও আদার তাবিজ শরীর থাইকা খুলবেন না। আর হ্যাঁ, শ্যাষ আরেকটা চেষ্টা আমি করবার চাই।

কী চেষ্টা?

নিদিয়া আপার সামনে আমি আদা ভাজতে চাই।

তাতে লাভ কী হবে?

আদার গন্ধে যদি আত্মাডা বাইরায় যায় তাইলে আমি নিজে ঐ আত্মারে হত্যা করব। আর শরীর থাইকা না বাইরাইলে কিছু করার থাকবে না। সম্ভব হইলে নিদিয়া আপার হাতে একটা তাবিজ বাইন্দা দিবার চাই। যদি কামডা করবার পারি তাইলে ঐ আত্মা হয়তো তার শরীরে নাও থাকবার পারে।

তাহলে এখনই করছি না কেন?

নিদিয়া আপার জন্য বড়ো আর শক্তিশালী একটা তাবিজ বানাইতে হবে। ঐ তাবিজ বানাইতেছি। আইজ রাইতে হইয়া যাবে। আগামীকাল তারে পরায় দিব। আর যখন আদা ভাজব, তখন তার হাত-পাও মুখ বাইন্দা রাখতে হবে। নয়তো আমাগোই আক্রমণ করবে। ভাইবা দেখেন, আদা ভাজবেন কি না। এখন যাই, রাইতে সমস্যা হইলে ডাইকেন।

কালু ফকির সালাম দিয়ে চলে গেল। শাফায়েত আহমেদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে এগারোটা বাজে। খুব বেশি রাত হয়নি, অথচ তার মনে হচ্ছে যেন রাত এখন অনেক গভীর!

পরেরদিন সকাল সাড়ে নয়টা।

নিদিয়া শুয়ে আছে তার কক্ষে। রুবিনা ভেতরে প্রবেশ করেছেন। খাটে বসতে নিদিয়া বলল, মা, তুমি কি একটু দূরে বসবে, ঐ যে চেয়ারটায়।

কেন?

তুমি কাছে বসলে আমি সুস্থ থাকতে পারি না। তোমার শরীরে আদার যে তাবিজ আছে ঐটা বড়ো কষ্ট দেয় আমাকে। আগেও বলেছি তোমাকে। আর কখনো তুমি আমার পাশে এসে বসবে না।

রুবিনা খানিকটা বিব্রত হলেন। তবে বাস্তবতা উপলব্ধি করে ঠিকই চেয়ারে বসে বললেন, নাস্তা খাবি না?

আমার ক্ষুধা নেই মা।

এভাবে না খেয়ে থাকলে হবে। শরীর খারাপ করবে তো। গতরাতেও কিছু খাসনি। গতকাল সারাদিন কোথায় ছিলি, কী খেয়েছিস তাও বলিসনি। আমি কি তোকে সুপ বানিয়ে দেবো?

ডানে-বামে মাথা নেড়ে নিদিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, মা তোমাকে একটা কথা বলব।

কী কথা?

আমার হয়ে একজনের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসতে হবে। আমি বড়ো খারাপ একটা কাজ করেছি গতকাল। করতে চাইনি। করতে বাধ্য হয়েছি। নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না।

কী বলছিস! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ মা। আমি যা বলব তা তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে, অথচ সবই সত্য বলব। কারণ তুমি আমার মা। তোমাকে আমার সবকিছু বলতেই হবে। আমি গতকাল বিয়ে করেছি মা।

এমন একটা কথা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না রুবিনা। তিনি কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর উঠে এসে

বসতে চাইলেন রুবিনার পাশে। পরে যখন মনে পড়ল রুবিনা নিজেই নিষেধ করেছে তখন আবার চেয়ারে বসে বললেন, তুই এসব কী বলছিস নিদিয়া!

হ্যাঁ মা, তোমাকে যা বলছি সব সত্য। ওর নাম রোমেল। তোমার সাথে একদিন ফোনে কথা বলেছিল। সত্যি বড়ো ভালো ও। বলতে পারো, গতকাল আমি অনেকটা জোর করেই বিয়েটা করেছি। তারপর ওর বাসায়ই ছিলাম। কিন্তু বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি খন্দকারের আত্মা। তাই সে আমাকে দিয়ে রোমেলকে মারধর করিয়েছে। আমি জানি না রোমেলের কী অবস্থা। তুমি দয়া করে ওর বাসায় যাবে। তারপর আমার পক্ষ হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। আমিই ক্ষমা চাইতে পারতাম। কিন্তু লজ্জায় আমার ফোন করতে ইচ্ছে করছে না। ফোন অবশ্য আর চালু করিনি। তুমি ইচ্ছে করলে বাবাকেও বলতে পারো। আর আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, কারণ আমি তোমাদের মতামত ছাড়াই বিয়ে করেছি। আমার অবশ্য কোনো উপায় ছিল না। খন্দকারের আত্মা যেভাবে আমার পিছু লেগেছে, তাতে আমি নিশ্চিত শয়তানটা আমার সর্বনাশ করবে।

রুবিনা কী বলবেন কিছু বুঝতে পারছেন না। তিনি একেবারে যেন বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছেন।

নিদিয়া ডেকে উঠল, মা।

বুকের মাঝে আটকে রাখা বাতাসটা ছেড়ে দিলেন রুবিনা। তারপর মুখ তুলে বললেন, তুই কি সব সত্য কথা বলছিস?

আগেই বলেছি মা, তোমাকে সব সত্য বলব।

আমার কাছে কেমন যেন সব এলোমেলো মনে হচ্ছে।

এলোমেলোই তো সবকিছু। আমি স্বাভাবিক নেই এবং স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছি না। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি এখন আতঙ্কের মধ্যে থাকি। কেন জানো? শুধু মুক্তির জন্য, ঐ খন্দকারের আত্মা থেকে আমি মুক্তি চাই। একটা কিছু করো মা।

কালু ফকির তোর সামনে আদা ভাজার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোর খুব কষ্ট হবে, কিন্তু তোর সম্মতি চাই।

আমি রাজি মা।

ঠিক আছে আমি তাকে বলছি। তোকে কি এক কাপ চা দেবো?

হ্যাঁ দাও, চা খাব।

আর ঠিকানাটা দে, আমি রোমেলকে দেখতে যাব।

নিদিয়া রোমেলের ঠিকানা আর মোবাইল নম্বর দিলে চলে গেলেন রুবিনা। বিছানা থেকে উঠে এবার আয়নার সামনে এলো নিদিয়া। নিজেকে দেখে নিজেই অবাক হলো সে। ঠোঁটের এককোনা ফুলে আছে। কালো ছোপ পড়েছে চোখের নিচে। দেখতেও নিজেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত লাগছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়। একটা কিছু তাকে করতে হবে, কিন্তু কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলে নিজেই হত্যা করবে খন্দকারের আত্মাকে, তবে বিষয়টা নিজের মধ্যে গোপন রাখবে যেন ভুলেও খন্দকারের আত্মা জানতে না পারে।

এদিকে রুবিনা এসেছেন রোমেলের বাসায়। রোমেলের হাতে ব্যান্ডেজ করা। পরিচয় দেওয়ার পর বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল রোমেল। অবশ্য রুবিনাই তাকে শান্ত করলেন। তারপর দুঃখপ্রকাশ করে জানতে চাইলেন কী অবস্থা।

রোমেল বলল, হাত মচকে গেছে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। নিদিয়া কোথায়?

ও বাসায় আছে। ওর অবস্থা ভালো না।

আমি ওর ফোন বন্ধ পাচ্ছিলাম।

লজ্জায় ফোন বন্ধ রেখেছে নিদিয়া। আমি গিয়ে বলব তোমাকে ফোন করার জন্য। তুমিও আসতে পারো। আমি খুশি হবো। নিদিয়াও খুশি হবে।

এই অবস্থায় আসব?

তোমরা একে অন্যকে পছন্দ করো, বিয়েও করেছ নিজেরা। এখন আর লুকোচুরি করে লাভ কী? আমি নিদিয়ার বাবার সাথে কথা বলেছি। তিনিও মেনে নিয়েছেন বিয়েটা। কাজেই তুমি নির্দ্বিধায় আসতে পারো। আর যদি মনে করো, সুস্থ হলে আসবে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তুমি কথা বলে নিও নিদিয়ার সাথে। আমি এসেছি আমাদের সম্মতির কথা জানাতে এবং তোমাকে দেখতে। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলবে।

অবশ্যই বলব।

রুবিনা এতক্ষণ বসেছিলেন। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো যে রুবিনার ওপর ছায়ামৃত্যুর এক অশুভ আত্মা ভর করেছে?

প্রথম প্রথম করিনি, কিন্তু গতকাল করেছি।

আমরা চেষ্টা করছি ঐ আত্মার নজর থেকে নিদিয়াকে মুক্ত করতে। জানি না কীভাবে সম্ভব। তবে আমাদের পারতেই হবে। তা না হলে নিদিয়ার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া বড়ো কঠিন হবে।

আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।

হ্যাঁ তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হবে। সময় হলে আমি তোমাকে জানাব। আর হ্যাঁ, তোমার-বাবা মাকে আমাদের সালাম দিয়ো। তাদেরও দাওয়াত থাকল আমাদের বাড়িতে। আমার আজই উচিত ছিল তাদের দাওয়াত করা। কিন্তু সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বুঝতে পারছি সময়টা এখন সঠিক নয়। কারণ আমি শঙ্কিত, খন্দকারের আত্মা আবার নিদিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তোমার বাবা-মায়ের সামনে কোনো অঘটন না ঘটায়। তখন আমরা মুখ দেখাতে পারব না। তোমার ওপরও চাপ পড়বে। এজন্য কিছুটা সময় নিচ্ছি। আসি, ভালো থেকো।

রুবিনা বাসা থেকে বের হয়ে গেলেন। তিনি আসার সময় বড়ো একটা ফলের ঝুড়ি, ফুল আর মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রোমেল অনুধাবন করল, সত্যি সে ভাগ্যবান, অন্তত তার শাশুড়ি ভাগ্য যে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

বিকেল তিনটা।

কালু বাবার ঘরে মেঝেতে একটা পাটির ওপর বসে আছে নিদিয়া। তার হাতে ছুরিটা দিয়েছে কালু ফকির। পাশে বসা রুবিনা আর শাফায়েত আহমেদ। তাদের পেছনে কুলসুম খালা। কালু ফকির বলল, শক্তভাবে ধইরা রাখেন ছুরিডারে।

নিদিয়া বলল, হ্যাঁ ধরেছি।

কোনো অসুবিধা হইতেছে?

শরীরে খুব জ্বালাপোড়া করছে।

এই জ্বালাপোড়া ছুরির জন্য না। আমাগো তাবিজের জন্য। আমাগো প্রত্যেকের শরীরে তাবিজ আছে, ঐ তাবিজ আপনের শরীরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতেছে। আসলে আপনের শরীরে না, খন্দকারের আত্মার মইধ্যে জ্বালাপোরা হইতেছে, ঐ জ্বালাপোড়া আপনের মাঝে আসতেছে। এইজন্য কষ্ট পাইতেছেন। আমি যহন আদা ভাজব আর আদার পানি জ্বাল দিব তহন কষ্ট আরো বাড়বে। ঐ কষ্ট আপনের সহ্য করা লাগবে। যদি দেখবার পারেন আত্মাডা বাইরায় আইছে সাথে সাথে ঐ আত্মার শরীরে ছুরি ঢুকায় দিবেন। দিনের বেলা আমরা আত্মাডারে দেখবার পারব না। কারণ আত্মা যার ওপর ভর করে সেই খালি দেখবার পারে। আর কেউ না। ভয় পাবেন না, কারণ দিনে আত্মা আপনের কোনো ক্ষতি করবার পারবে না। তয় আত্মা শরীর থাইকা বাইর হবে বলে মনে হয় না। বড়ো খারাপ আত্মা। আরেকটা কথা, ব্যথা সহ্য করবার না পাইরা আবার নিজের শরীরে ছুরি ঢুকায়েন না। তাইলে আপনের আর আত্মার দুইজনেরই মৃত্যু হবে। ভুলেও এই কাম করা যাবে না। বুঝবার পারছেন আপা?

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল নিদিয়া।

মাটির চুলা আগেই নিয়ে এসেছিল কুলসুম খালা। কালু ফকির

ইঙ্গিত করতে আগুন ধরাল সে। ওপরে একটা পাতিল রয়েছে। প্রথমে আদা ভাজা হবে, তারপর পানি ঢালা হবে। আদা ভাজা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারল নিদিয়া। যখন পানি থেকে ধোঁয়া বের হতে আদার আরো তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে, অস্থির হয়ে উঠল নিদিয়া। এক সময় কাঁপতে শুরু করল তার শরীর। নিজে থেকেই বলল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মা।

রুবিনা এগিয়ে এসে বললেন, আরেকটু কষ্ট করতে হবে।

শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

ধৈর্য ধর মা, ধৈর্য ধর।

শাফায়েত আহমেদ এবার তাকালেন কালু ফকিরের দিকে। কালু ফকির চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে একটা কিছু বলছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। এক সময় সে সামনে ঝুঁকে আসছে আবার সোজা হচ্ছে। তারপর ফুঁ দিচ্ছে পানিতে। এভাবে বেশ কয়েকবার সামনে ঝুঁকে আসা আর সোজা হওয়ার পর হঠাৎই বলে উঠল, আত্মা ভয়ংকর, বড়ো ভয়ংকর।

শাফায়েত আহমেদ নিচু গলায় বললেন, নিদিয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট হবেই, আত্মা ভয়ংকর, বড়ো ভয়ংকর। আত্মারও কষ্ট হইতেছে, নিদিয়া আপারও হবে, আরো সহ্য করা লাগবে।

নিদিয়ার শরীর এখন থরথর করে কাঁপছে।

কাঁপুক, শয়তানডার শরীরও কাঁপতেছে। এক সময় আর থাকবার পারবে না। শরীর থাইকা বাইর হইয়া আসবে। ঐ সময়ই ছুরি ঢুকায় দিতে হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে চোখ খুলল কালু ফকির। তারপর কয়লার আগুনে খোঁচা দিলো একটা লোহার শলাকা দিয়ে। তাতে আগুনটা যেন আরো তেজি হয়ে উঠল। পানিও ফুটতে শুরু করল টগবগ করে। আদার ঝাঁঝাল গন্ধে টিকে থাকা দায়। গন্ধের তীব্রতা পাওয়ায় পাতিলের মধ্যে আরো আদা দিলো সে।

বলতে গেলে সম্পূর্ণ ঘরটা এখন আদার গন্ধে ভরে আছে। হঠাৎই নিদিয়ার শরীর প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো। সাথে সাথে কালু ফকির বলল, আত্মাডা বাইরায় আসতেছে, বাইরায় আসতেছে।

কালু ফকিরের কথার মাঝেই উঠে দাঁড়াল নিদিয়া। তারপর ছুটে

বের হয়ে গেল ঘর থেকে। ছুরিটা পড়ে থাকল নিচে। শাফায়েত আহমেদ বললেন, নিদিয়া তো চলে গেল।

কালু ফকির ডানে-বামে মাথা নেড়ে বলল, বড়ো শক্ত আত্মা।

শক্ত মানে!

এইরকম আদার গন্ধেও শরীর থাইকা বাইর হয় নাই। মনে হয় না, আদার গন্ধে ঐ আত্মারে বাইর করা যাবে।

তাহলে?

ঐ আত্মা নিদিয়া আপার শরীরের মইধ্যেই থাকবে।

নিদিয়ার কী হবে?

আমি বলবার পারতেছি না। তয় স্যার, আবার চেষ্টা করতে পারি।

এবার রুবিনা বললেন, না না, আর না। মেয়েটার বড়ো কষ্ট হয়। ওর কষ্ট আমি সহ্য করবার পারি না। একমাত্র মেয়ে আমার। আপন অন্য কোনো চিন্তাভাবনা করেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন শাফায়েত আহমেদ।

কালু ফকির এবার টেনে টেনে বলল, অন্য চিন্তা বা উপায় আপনে গো ভালো লাগবে না।

কেন?

আপনেরা অনুমতি দিলে আমি বলবার পারি।

বলুন।

নিদিয়া আপারে শিকল দিয়া বাইন্দা রাখা লাগবে, আগেই বলছিলাম। তারপর তার সামনে আদার পানি জ্বাল দিয়া আত্মাডারে শরীর থাইকা বাইর করতে হবে। আত্মাডা যদি চইলা যায় তাইলে ভালো। না গেলে তার শরীরে ছুরি ঢুকান লাগবে। কিন্তু নিদিয়া আপা পারবে কি না সন্দেহ আছে, তার হাত-পা বান্দা থাকবে। আর যদি আমার সামনে আত্মা বাইর হয়, তাইলে তো কথাই নাই। একবারে ঐ আত্মার বুকে ছুরি ঢুকায় দিব। এই উপায়ে আত্মাডা মনে হয় তাড়ান যাবে।

রুবিনা সাথে সাথে মাথা নেড়ে বললেন, না না, আমার মেয়েরে আমি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারব না।

তাইলে তো আর কিছু করা যাবে না।

করা না গেলে না যাবে।

কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন রুবিনা। তার পেছনে এলেন শাফায়েত আহমেদ। সোফায় বসে বললেন, আমাদের মনে হয় নাহিয়ানকে খবর দেওয়া দরকার।

রুবিনা মাথা নেড়ে বললেন, না, ছেলে বাইরে পড়াশোনা করছে, থাক। ওকে আর এই বিপদে টানতে চাচ্ছি না।

ওর বড়ো বোন, পাশে থাকলে হয়তো কোনো কাজেও লাগতে পারে।

না না, আত্মাটা বড়ো খারাপ। শেষে দেখা যাবে আবার নাহিয়ানের ওপর নজর পড়েছে। তার থেকে বরং আমরা বিদেশে চলে যাই, চলো। তুমি ব্যবস্থা করো।

কোথায় যাবে?

আমেরিকা যাই। ওখানে ভালো একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাই।

নিদিয়ার অসুখ কি সাইকিয়াট্রিস্ট সারাতে পারবে? অবশ্য আমি নিজেই দ্বিধান্বিত। আমারও মনে হয় দেখানো উচিত।

মনে তো অন্তত সান্ত্বনা পাব যে চেষ্টা করেছি।

ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি।

এমন সময় কুলসুম খালা ভেতরে প্রবেশ করল। সে সামনে এসে বলল, আমি বাড়ি যাবার চাই।

রুবিনা অবাক হয়ে বলল, কেন?

আমার ভালো লাগতেছে না। মনে হইতেছে এই বাড়িতে খারাপ কিছু ঘটবে। থাকবার জন্য মন টানতেছে না।

কীসব বলছেন খালা!

হুঁ আম্মা। আমারে যাবার অনুমতি দেন।

ঠিক আছে যদি যেতে চান আর দুই-একটা দিন থেকে তারপর যান।

আইচ্ছা।

কুলসুম খালা মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। রুবিনা আর শাফায়েত আহমেদ দুজনের কেউ আর কোনো কথা বললেন না। গম্ভীর হয়ে গেলেন। এই বাড়িতে সত্যি যে খারাপ কিছু ঘটবে তা যেন তারা অনুধাবন করতে পারছেন।

দশ মিনিট পর দারোয়ান এসে বলল, কুলসুম খালা বাড়ি চইলা

গেছে। যাওয়ার আগে বইলা গেছে, এই বাড়ির কেউ মারা যাবে, তাই সে আর থাকবার চাইতেছে না।

শাফায়েত আহমেদ আর রুবিনা দুজনেই কোনো উত্তর দিলেন না। তারা নিজেরাও আশঙ্কা করছেন, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটবে। তবে কি তারা জানেন না।

সন্ধ্যার পর থেকে বড়ো আতঙ্কে ছিল নিদিয়া। এই বুঝি খন্দকারের আত্মা বের হয়ে আসে তার শরীর থেকে। এখন রাত এগারোটা বাজে। আত্মাটার কোনো খবর নেই। বেশ অবাক হচ্ছে সে। অবশ্য একটা কারণ সে বের করেছে। তার কক্ষের মধ্যে ধাতব ছুরিটা আছে। টেবিলের ওপর রেখেছে, যেন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। হয়তো ঐ ছুরির ভয়ে আসছে না আত্মা, এরকমই অনুমান করল সে।

সন্ধ্যার পর ফোন করেছিল রোমেল। ফোনটা ধরেনি নিদিয়া। প্রথম কারণ লজ্জা। যে ব্যবহার সে করেছে রোমেলের সাথে তাতে তার সামনে সে মুখ দেখাবে কীভাবে? কথা বলতেও সংকোচ হচ্ছে তার। যদিও তার মা রোমেলকে দেখতে গিয়েছিল, তারপরও নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারছে না সে। দ্বিতীয় কারণ সময়টা সন্ধ্যার পর হওয়ায় এ মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না সে। সন্ধ্যার পর খন্দকারের আত্মা তার সকল কথাবার্তা শুনতে পাবে, তার কার্যক্রম দেখতেও পাবে। এ মুহূর্তে আত্মাকে সে অহেতুক খ্যাপাতে চাচ্ছে না। বরং মনে মনে পরিকল্পনা করছে, কীভাবে আত্মাকে হত্যা করা যায়। কিন্তু সুবিধাজনক কোনো উপায় সে বের করতে পারেনি এখন পর্যন্ত।

টেবিলের সামনে এলো নিদিয়া। ছুরিটা বেশ সরু। চকচক করছে। হাতে নিয়ে দেখল সে। ছুরি হাতে নিলে অবশ্য তার শরীরে কোনো জ্বালাযন্ত্রণা হয় না। ভালো এক সুবিধা আছে এতে। নিজের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করতে পারবে। শরীরে জ্বালাযন্ত্রণা হলে শক্তিপ্রয়োগ যথাযথভাবে সম্ভব না। ছুরিটা দিয়ে খন্দকারের আত্মাকে দুটি উপায়ে হত্যা করতে পারবে। প্রথমত আত্মা বাইরে থাকলে আত্মার শরীরে ছুরিটি ঢুকিয়ে দেওয়া, দ্বিতীয় উপায় আত্মা বের না হলে তার নিজের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় উপায়ে তার নিজের মৃত্যু ঘটবে, যা সে করতে চাচ্ছে না।

নিদিয়া ছুরিটা আবার টেবিলের ওপর রেখে দিলো। তারপর এলো দরজার সামনে। একবার ভাবল দরজাটা বন্ধ করে দেবে। পরে মত পালটাল। দরজাটা খোলাই রাখতে চাচ্ছে সে। এরকমই বুদ্ধি দিয়েছে কালু ফকির। প্রয়োজনে যে-কেউ ঢুকে ছুরি নিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আত্মার ওপর।

আয়নার সামনে এলো নিদিয়া। ঘুমানোর আগে চুল আঁচড়ানো তার পছন্দ। বেশ সময় নিয়ে সে চুল আঁচড়াল। এর মধ্যে দুবার তার মনে হয়েছিল খন্দকারের আত্মা বোধহয় বের হয়ে এসেছে তার শরীর থেকে। কিন্তু আসেনি। একটা বিষয় সে বুঝতে পারছে তার অবচেতন মন একটা শঙ্কায় ভুগছে, এই শঙ্কাটা খন্দকারের আত্মার আবির্ভাব হওয়ার শঙ্কা। না চাইলেও শঙ্কাটা তার মধ্যে কাজ করছে।

আয়নার সামনে থেকে ওঠার ঠিক আগে আবার রিং হতে লাগল মোবাইল ফোনে। রোমেল ফোন করেছে। তার উচিত রোমেলের ফোন ধরা। রোমেল তার স্বামী। স্বামীর ফোন ধরা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু সে সাহস পাচ্ছে না। মনের শঙ্কাটা তাকে বেশি শঙ্কিত করে রেখেছে। আগের মতোই বারবার মনে হচ্ছে ফোন ধরলে রোমেলের বিপদ বাড়বে। সে এই মুহূর্তে তার নিজের বিপদ নিয়ে যতটা-না আতঙ্কিত থাকে তার থেকে বেশি আতঙ্কিত রোমেলের বিপদ নিয়ে। তার জন্যই আজ রোমেল বিপদগ্রস্ত।

লম্বা একটা হাই দিলো নিদিয়া। সে বুঝতে পারছে শরীর একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তাই শুয়ে পড়ল চাদর টেনে। ঘুমিয়েই পড়েছিল বোধহয়। এক সময় অনুভব করল, কেউ একজন আছে তার কক্ষে। তার শরীরের ওপর থেকে চাদরটা টেনে সরিয়ে ফেলছে। চোখ খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শরীরটা যেন বড়ো বেশি দুর্বল। কে থাকতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল নিদিয়া। ঠিক যেন মনে করতে পারছ না। বুঝতে পারছে তার জেগে ওঠাটা বড়ো জরুরি। কিন্তু তাও পারছে না। বড়ো ক্লান্ত যেন শরীর।

হঠাৎই কানের কাছে ফিসফিস করে তার নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনল, নিদিয়া নিদিয়া।

নিদিয়া অস্পষ্টস্বরে বলল, কে?

আমি খন্দকার।

আপনি এখানে কেন?

আমি তো তোমার মইধ্যেই আছি।

কেন?

আমি তোমারে চাই নিদিয়া, আমার মতো করে চাই। তুমি জানো, তুমি আমার স্ত্রী। এজন্য আমি তোমার মইধ্যে থাকি। তোমারে কামনা করি, ঠিক আমার নিজের মতো করে।

খন্দকারের একটা হাত নিদিয়ার হাতের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে। নিদিয়া স্পষ্ট অনুভব করছে। তাড়াতাড়ি সে বলল, না, আপনি আমাকে পেতে পারেন না। আমি আপনার স্ত্রী নই, আমি রোমেলের স্ত্রী। আর একই কথা আপনি বারবার বলেন, আর বলবেন না।

তুমি আবার ভুল করছ, আমারে ভালোবাসার কথা বলতে তুমি নিষেধ করবার পারো না। আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী। তোমার প্রতি আমার অধিকার আছে।

না, আমার প্রতি আপনার কোনো অধিকার নেই। আমি আপনার কেউ না।

খন্দকার এবার কড়া গলায় বলল, অবশ্যই অধিকার আছে। তুমি আমারে বঞ্চিত করতেছ। আমি চাই তুমি আমার হবা, শুধুই আমার। তা না হইলে আমি তোমার ওপর জোর করব।

এটা অন্যায়।

স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্পর্ক কোনো অন্যায় হবার পারে না।

অবশ্যই অন্যায়। আমার অনিচ্ছায় আপনি আমাকে জোর করতে পারেন না। আমার নিজের চাওয়াপাওয়া আছে, স্বাধীনতা আছে।

আমার চাওয়াপাওয়াই তোমার চাওয়াপাওয়া, আমার স্বাধীনতাই তোমার স্বাধীনতা।

না, এরকম হতে পারে না।

এমনটাই হয়, এটাই নিয়ম। আমি তোমারে ভালোবাসি, দারুণ ভালোবাসি। তোমারে ছাড়া আমি থাকবার পারতেছি না। তোমারে চাই নিদিয়া, তোমারে আমি চাই।

নিদিয়া শুনছিল আর অনুভব করছিল খন্দকার তার একেবারে কাছে চলে এসেছে। এখন তাকে টেনে নিচ্ছে তার শরীরের আরো

কাছে। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। শরীর দুর্বল, সত্যি বড়ো দুর্বল। এক সময় খন্দকার তার কামিজের বোতাম খুলতে শুরু করল। নিদিয়া অনুধাবন করল ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল খন্দকারকে। কিন্তু পারল না। শেষে 'মা বাঁচাও, বাঁচাও, বাবা, বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করে উঠল।

তবে চিৎকারটা তিনবারের বেশি সে করতে পারল না। খন্দকারের একটা হাত তার মুখ চেপে ধরল। তারপরও নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল নিদিয়া। কিন্তু খন্দকারের যেন অসুরের শক্তি, পারছে না সে। এরই মধ্যে কামিজের বোতাম খুলতে না পেরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল সামনের অংশ। নিদিয়া আর থাকতে না পেরে জোরে কামড়ে ধরল খন্দকারের হাত। সাথে সাথে খন্দকার উহ্ করে হাত টেনে নিল। তারপর কষে দুটো চড় লাগাল নিদিয়ার গালে। তীব্র ব্যথার মধ্যেই আবার বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে উঠল নিদিয়া।

দরজা খোলা ছিল। এজন্য ভেতরে প্রবেশ করতে পারলেন শাফায়েত আহমেদ। তার পেছন পেছন এলেন রুবিনা। এসে দেখলেন বিছানায় ছটফট করছে নিদিয়া। মনে হচ্ছে কেউ তাকে জোর করে শুইয়ে রেখেছে বিছানায় আর সে ছোটার চেষ্টা করছে। তারা এসে পৌঁছাতে উঠে বসল নিদিয়া। তারপর রুবিনাকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে উঠল। মাত্র তিন সেকেন্ড। তারপর চাদর গায়ে দিয়ে সরে গেল বিছানার কোনায়। গুটিশুটি মেরে বসে থাকল বৃষ্টিতে ভেজা কাকের মতো।

রুবিনা ভয়ে ভয়ে বললেন, কী হয়েছে মা?

নিদিয়া মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

এবার শাফায়েত আহমেদ বললেন, রুবিনা, এরকম কাঁপছ কেন?

রুবিনা কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

শাফায়েত আহমেদ এবার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। নিদিয়া হাত উঁচু করে সাথে সাথে নিষেধ করল। শাফায়েত আহমেদ বুঝলেন তাদের আদার তাবিজের কারণে ভয় পাচ্ছে নিদিয়া।

আয় মা, আমার কাছে আয়।

ডাকলেন রুবিনা।

নিদিয়া কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকল তার মা রুবিনার দিকে। তারপর মাথা নিচু করে তাকাল নিজের পোশাকের ওপর। সত্যি সামনের অংশ ছিঁড়ে গেছে। খন্দকার যে আসলেই এসেছিল তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। তার মনে একটু সন্দেহ ছিল যে সম্পূর্ণ ঘটনাটা স্বপ্ন কি না, এখন বুঝতে পারছে পুরোটাই ছিল বাস্তব।

আয় মা আয়, আমার কাছে আয়।

আবারও ডাকলেন রুবিনা।

নিদিয়া এবার ডানে-বামে মাথা নাড়াল। তারপর বলতে চেষ্টা করল, না আমি আসব না। কিন্তু তার মুখ দিয়ে এই শব্দগুলো বের হলো না। পুরুষালি কণ্ঠে যে শব্দ বের হলো সেগুলো হলো, 'তোরা সব বদমাইশ, বেইমান, আমার স্ত্রী নিদিয়ারে আমার কাছ থাইকা নিয়া যাবার চাস, পারবি না, পারবি না। আমি তারে মেলা ভালোবাসি, মেলা। নিদিয়াও আমারে ভালোবাসে, অনেক ভালোবাসে। আমাদের গোপন ভালোবাসার সময় তোরা খালি বিরক্ত করস। তোরা মানুষ ভালো না।'

কথাগুলো শুনে একেবারে চুপসে গেলেন রুবিনা আর শাফায়েত আহমেদ। দরজার কাছে ততক্ষণে হাজির হয়েছে কালু ফকির। তার কপালেও ভাঁজ। বোঝা যাচ্ছে বড়ো চিন্তিত সে।

দারোয়ান এসে জানাল পুলিশ এসেছে। শাফায়েত আহমেদ ঘড়ি দেখলেন। রাত দুইটা বাজে। তিনি উঠে বাইরের গেটে এলেন। সুন্দর চেহারার একজন অফিসার বললেন, আমি ইন্সপেক্টর সালাম, থানার ওসি।

ও আসুন আসুন। হঠাৎ এখানে!

আসলে আপনাদের বাসার বিষয়ে একটা অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। গতকালও একই অভিযোগ পেয়েছিলাম আমরা।

কী অভিযোগ?

একজন মেয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। আমার অফিসার গতকাল এসেছিল। কিন্তু কিছু পায়নি। এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে নাকি আপনাদের বাসায়?

শাফায়েত আহমেদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আসুন, আমার সাথে আসুন।

ওসি সাহেবের সাথে দুজন পুরুষ সাব-ইন্সপেক্টর এসেছে। সবাই ড্রয়িংরুমে এলে তিনি সংক্ষেপে খুলে বললেন পুরো ঘটনা। ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, এই যুগে একজন মেয়ের ওপর একটা মৃত আত্মা ভর করেছে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

আপনাদের মতো আমিও বিশ্বাস করিনি। আমার স্ত্রী তো পাশেই আছে, সেও বিশ্বাস করেনি। যাইহোক, আপনারা আসুন, আমি নিদিয়ার রুমে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।

নিদিয়ার রুমের ভেতর প্রবেশ করতে নিদিয়া এককোনায় গিয়ে দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো লাগছে তাকে। চোখেমুখে ক্লান্তি, একই সাথে ভয়। ওসি সাহেব আর দুই সাব-ইন্সপেক্টরকে দেখে সে পুরুষালি কণ্ঠে বলল, তোরা কারা?

এমন একটা প্রশ্নের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না ওসি সাহেব।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি এখানকার থানার ওসি।

এই বাড়িতে কী চাস?

কোনো সমস্যা আছে আপনার?

আমার সমস্যার কথা শুইনা তুই কী করবি?

সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমি বেশ অবাক হচ্ছি। আপনি একজন নারী, কিন্তু কথা বলছেন পুরুষের কণ্ঠে। কেন?

তাতে তোর কী?

না কিছু না। তবে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক তো, তাই জিজ্ঞেস করলাম। কিছুক্ষণ আগে কি আপনিই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিলেন?

ডানে-বামে মাথা নেড়ে নিদিয়া বলল, না না, আমি না। চিৎকার করছিল নিদিয়া।

তাহলে আপনি কে?

আমিও নিদিয়া।

ওসি সাহেব শাফায়েত আহমেদের দিকে তাকালেন। তারপর বলল, আপনার বাবা বলছিলেন যে আপনিই সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন।

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। এই বাড়ির সবাই মিথ্যুক। তারা আমারে মাইরা ফেলাবার চায়। সবাই আদার তাবিজ পইরা আছে। আমি পছন্দ করি না। কিন্তু আমার কথা কেউ শোনে না। আমারে কষ্ট দিতেছে। কিন্তু আমারে কেউ মারতে পারবে না। তুইও পারবি না। যা, এই বাড়ি থাইকা চইলা যা, যা ভাগ হারামজাদা।

গালি শুনে ওসি সাহেব বুঝলেন সত্যি কোথাও-না-কোথাও গন্ডগোল আছে। বাইরে বের হয়ে এলেন তিনি। শাফায়েত আহমেদ বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে পুরো বাড়ি সার্চ করে দেখতে পারেন।

না প্রয়োজন নেই। কিন্তু নিদিয়ার কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি?

কালু ফকির করছে।

আমার মনে হচ্ছে বিষয়টা মানসিক। ভালো একজন মনোরোগবিশেষজ্ঞ দেখান।

আমরা আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি।

তাহলে তো ভালোই। আসি, অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আসলে কী করব বলুন, মানুষ ফোন করে আর আমাদের আসতে হয়। আপনার মেয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করছি। আর কোনো প্রয়োজন হলে জানাবেন। এই যে আমার ভিজিটিং কার্ড। ফোন নম্বর লেখা আছে। ভালো থাকবেন।

থানার ওসি চলে যাওয়ার পর নিদিয়া গান গাইতে শুরু করল। তবে নারীর কণ্ঠে নয়, পুরুষের কণ্ঠে। হেমন্ত মুখার্জির বিখ্যাত সেই গান,

এই রাত তোমার আমার
ঐ চাঁদ তোমার আমার
শুধু দুজনে
এই রাত শুধু যে গানের
এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণের...
তুমি আছো আমি আছি তাই
অনুভবে তোমারে যে পাই
শুধু দুজনে
এই রাত তোমার আমার।

রুবিনা কাঁদতে শুরু করলেন। শাফায়েত আহমেদ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেও দারুণভাবে বিস্মিত হলেন। কারণ নিদিয়ার পুরাতন দিনের গান পছন্দ নয়। গানটির কথা সুর তার মনে রাখার কথা নয়। অথচ কী সুন্দর গান গেয়ে যাচ্ছে নিদিয়া।

আধঘণ্টার মতো গান গাওয়ার পর হঠাৎই কক্ষের মধ্যে সবকিছু ভাঙতে শুরু করল নিদিয়া। একই সাথে বিচ্ছিরি ভাষায় বকতে থাকল কাউকে। দশ মিনিটের মতো চলল এই তা-ব। পাশের বাসার দারোয়ান এসে মাঝে জেনেও গেল কী ঘটছে। বোঝা যাচ্ছে খুব বিরক্ত তারা।

কালু ফকিরের পাশেই ছিলেন শাফায়েত আহমেদ। অসহায় দৃষ্টিতে তিনি বললেন, কী করব এখন?

আমার মনে হয় পরিস্থিতি আরো জটিল হইতেছে। আত্মাডা ভয়ংকর কোনো পরিকল্পনা করতেছে।

কী পরকল্পনা?

জানি না স্যার। এই মুহূর্তে বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতি যেন করবার না পারে এইজন্য উচিত আত্মাডারে বাইন্দা রাখা।

শাফায়েত আহমেদ চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, কীভাবে বাঁধব!

আগেই বলছি শিকল দিয়া।

আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আপনে হয়তো ঐরকমই ভাববেন স্যার। কিন্তু আমি বাস্তব কথা বলতেছি। নইলে আরো বড়ো ধরনের বিপদ হবে। এখন তো জিনিসপত্র ভাঙতেছে, পরে কী করে বুঝা মুশকিল। আমি...

কথা শেষ করতে পারল না কালু ফকির। দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো নিদিয়া। তারপর কাউকে কিছু না বলে সোজা বের হয়ে যেতে থাকল বাসা থেকে। শাফায়েত আহমেদ পেছন থেকে ডাকলেও শুনল না। গেটে দারোয়ান বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো তাকে। তারপর হাঁটতে শুরু করল ফুটপাত দিয়ে।

নিদিয়ার পেছন পেছন শাফায়েত আহমেদ, কালু ফকির বাসস্ট্যান্ডে এসেছে। মাঝে নিদিয়ার সাথে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছেন শাফায়েত আহমেদ, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। বাসস্ট্যান্ডে এসে যাত্রী ছাউনিতে বসেছে নিদিয়া। শাফায়েত আহমেদ কালু ফকিরকে বললেন, নিদিয়া কী করতে চাচ্ছে?

মনে হইতেছে কুমিল্লা যাবে।

তার মানে খন্দকারের আত্মা নিদিয়াকে বাড়ি নিয়ে যাবে।

হুঁ ঐরকমই।

ওখানে নিয়ে গেলে আমরা তো অসহায় হয়ে পড়ব। কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারব না নিদিয়াকে।

আপনে ঠিকই বলছেন স্যার।

আমারা কী করতে পারি?

এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। আমার মাথা কাজ করতেছে না। জোরাজোরি করলেও বিপদ। আবার পুলিশ আইসা হাজির হবে। তাগো বুঝান মুশকিল হবে যে নিদিয়া আপার বাবা আপনি নিজে।

আমিই কি পুলিশকে খবর দেবো?

লাভ হবে বইলা মনে হবে না। নিদিয়া আপার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নাই। খন্দকার যা বলতেছে তাই করতেছে। আসলে বলতেছে না, তারে দিয়া করাইতেছে।

কিন্তু আমি কিছুতেই নিদিয়াকে কুমিল্লা যেতে দিতে চাচ্ছি না।

এইখানে কিছু করবার পারবেন না। কারণ নিদিয়া আপা আপনার ওপর চইটা যাবে। তখন আশেপাশের পাবলিক আপনেরে সমর্থন করবে না।

শাফায়েত আহমেদের পেছনে বাড়ির ড্রাইভার এসেছে। গাড়িও এনেছে সে। তার সাথে এসেছে হালিম। কিন্তু নিদিয়াকে গাড়িতে

ওঠানোর মতো অবস্থা নেই। তারপরও শেষ চেষ্টা করবেন ভেবে ধীরে ধীরে নিদিয়ার কাছে গেলেন তিনি। তারপর খানিকটা দূরত্বে বসে বললেন, নিদিয়া, বাড়ি চল মা।

নিদিয়া একদৃষ্টিতে তাকাল।

চল মা।

নিদিয়া কোনো কথা বলল না।

আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। পাগলামি করিস না।

নিদিয়া এবার উঠে দাঁড়াল। তারপর হেঁটে গিয়ে উঠল কুমিল্লার একটা গাড়িতে। এই গাড়িটা রাতের শেষ প্রহরে কুমিল্লার উদ্দেশে রওনা দেয়, পৌঁছে যায় সূর্য ওঠার আগেই। দুই ঘণ্টা সময় লাগে।

শেষে শাফায়েত আহমেদ নিজেও উঠলেন গাড়িতে। কালু ফকির আর হালিম তার সঙ্গী হলো। মিনিট দশেক পর গাড়ি ছাড়ল কুমিল্লার উদ্দেশে। শাফায়েত আহমেদের আগেই তার নিজের গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রেখেছিলেন। সেই টাকা দিয়ে সবার ভাড়া পরিশোধ করলেন।

কন্ডাক্টার খানিকটা অবাকই হলো সবার আচরণ দেখে। অবশ্য সে তেমন কিছু বলল না। শাফায়েত আহমেদ নিরাপত্তার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে খবর দিলেন। তার থানার ওসির মাধ্যমে সাহায্য চাইলেন কুমিল্লা পুলিশের। কুমিল্লা পুলিশ জানাল যে তারা বাসস্ট্যান্ডে থাকবে।

কুমিল্লা যখন গাড়ি পৌঁছাল তখনো সূর্য উঠতে খানিকটা সময় বাকি আছে। গাড়ি থেকে নেমেই হাঁটা শুরু করল নিদিয়া। শাফায়েত আহমেদ তাকে থামাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। দুজন নারী পুলিশ এগিয়ে এলে ধাক্কা দিয়ে তাদের মাটিতে ফেলে দিলো নিদিয়া। তারপর দৌড়াতে শুরু করল। এত জোরে যে অন্য কেউ তার সাথে দৌড়ে পারছে না। রাস্তায় যে অল্প কয়েকজন মানুষ ছিল তারা সবাই অবাক হয়ে দেখছে যে একজন নারী দৌড়াচ্ছে আর পুলিশ-সহ কয়েকজন ব্যক্তি তার পেছন পেছন ছুটছে।

সূর্য ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে নিদিয়া এসে পৌঁছাল খন্দকারের বাড়ির গেটে। শাফায়েত আহমেদ আর হালিম দ্রুত হেঁটে গিয়ে আগলে ধরল গেট। নিদিয়া এত জোরে চড় কষাল হালিমের গালে যে

হালিম ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। পড়ে গেল নিচে। তার একটা দাঁতও বের হয়ে এলো মুখ থেকে, সাথে তাজা রক্ত। নিদিয়া হালিমের হাত থেকে বাড়ির চাবি নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় শাফায়েত আহমেদকেও জোরে ধাক্কা দিলো সে। শাফায়েত আহমেদ ছিটকে গিয়ে পড়লেন দেওয়ালের ওপর। তাতে মাথা ফেটে রক্ত বের হয়ে এলো তার। অতিরিক্ত পরিশ্রম, মানসিক চাপ আর ধাক্কার ধকলটা সইতে পারলেন না তিনি। জ্ঞান হারালেন।

এদিকে নিদিয়া এগিয়ে চলছে। আসলে এগিয়ে চলছে বললে ভুল হবে। তাকে খন্দকারের আত্মা বাধ্য করছে হাঁটতে। নিচে বারান্দার সামনে এসে কোলাপ্সিব্‌ল গেটের তালা খুলতে বাধ্য হলো নিদিয়া। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। খন্দকার তাকে হাঁটিয়ে একেবারে মাটির নিচের কক্ষে নিয়ে এলো। তারপর ধীরে ধীরে বের হয়ে এলো নিদিয়ার শরীর থেকে। অতঃপর সুইচে চাপ দিয়ে বাতি জ্বালাল খন্দকার।

ক্লান্তিতে নিদিয়া একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। তার শরীর কাঁপছে। কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। শেষে না পেরে নিচে মেঝেতে বসে পড়ল।

কক্ষটিতে সব পুরাতন মালামাল রাখা। খন্দকার হেঁটে গিয়ে একটা ছবি নিয়ে এলো। তারপর ছবিটা নিদিয়ার সামনে ধরে বলল, এই যে ছবিটা দেখতেছস?

নিদিয়া ছবিটা দেখল। লায়লার ছবি। আগে দেখেছে সে।

খন্দকার বলল, এই হইতেছে লায়লা, আমার স্ত্রী।

নিদিয়া কিছু বলল না।

তুই দেখতে লায়লার মতো। আমি তোর মধ্যে আমার লায়লারে খুঁইজা পাই। এইজন্যই তোরে আমি ভালোবাসি। পাগলের মতো ভালোবাসি। তুইও আমারে ভালোবাসবি, আমি যেইভাবে চাইব, সেইভাবে। ঠিক আছে?

নিদিয়া কোনো কথা বলল না, শুধু মাথা নিচু করে থাকল।

হঠাৎই রেগে উঠল খন্দকার। ধমকে উঠে বলল, কথা বলতেছিস না কেন?

আমাকে যেতে দেন।

কথাটা শুনে আরো রেগে গেল খন্দকার। আচমকাই চুলের মুঠি ধরল নিদিয়ার। তারপর চিৎকার করে উঠে বলল, তোরে যাবার দিব মানে! তুই আমার স্ত্রী, আমার বউ। এইখানেই থাকবি, এই বাড়িতে। আর যদি কোনোরকম ষড়যন্ত্র করছস, তাইলে আগে তোর বাপ-মারে মারব। তারপর মারব অন্য সবাইরে। তোর পরিবারের কাউরে আমি বাঁচবার দিব না। খালি আমি তোর স্বামী বাঁইচা থাকব। তখন তুই যাবি কোথায়? আমার এই জায়গায়ই থাকা লাগবে। বুঝছস আমার কথা?

নিদিয়া চুপ।

কথা বলতেছিস না ক্যান?

আ...আমি পানি খাব।

না, তোরে পানি দিব না। কিচ্ছু দিব না। আগে তুই আমারে ভালোবাসবি, তারপর তোরে পানি দিব। তুই আমার সাথে বেইমানি করছস। আমার মতো স্বামী থাকার পরও তুই অন্যজনরে বিয়া করছস। তোরে আমি ছাড়ব না, কিছুতেই না। আ...আমার ইচ্ছা করতেছে তোরে আমি গলা টিপা মাইরা ফেলাই। কিন্তু আমি পারব না, ক্যান পারব না জানস? আমি তোরে ভালোবাসি, এইজন্য। আমি...

কথার মাঝে হঠাৎই থেমে গেল খন্দকার। তারপর বলল, দিনের উলো উঠতেছে। আমি এহন আর কথা বলবার পারব না। তোর শরীরের মইধ্যে ঢুইকা থাকব। তার আগে তোরে বাইন্দা রাইখা দিতেছি যেন পালাবার না পারস। খবরদার পালাবার চেষ্টা করবি না, কিছুতেই না।

কথাগুলো বলতে বলতে নিদিয়ার হাত-পা পুরাতন কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলল খন্দকার। ওড়নাটাকে ছিঁড়ে দুই ভাগ করল সে। অর্ধেক দিয়ে বাঁধল মুখ, আর বাকি অর্ধেক দিয়ে চোখ। তারপর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো। বাতাসে মিশে গিয়ে প্রবেশ করল নিদিয়ার শরীরে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই সূর্য উঠল পূর্ব আকাশে।

পুলিশ আর কালু ফকির শাফায়েত আহমেদকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল কাছের ক্লিনিকে। জ্ঞান ফিরে আসতে দুই ঘণ্টা সময় লেগেছে। এরই মধ্যে থানা থেকে ওসি আব্দুল হামিদ এসে পৌঁছেছেন। ঢাকা থেকে চলে এসেছেন রুবিনাও। ওসি সাহেব খন্দকার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। শাফায়েত আহমেদ রুবিনার দিকে তাকাতে রুবিনা বললেন, আপনারা প্রবেশ করতে চাইলে করতে পারেন। তবে আমাদের আরেকটু ভাবার সময় দেন।

ওসি সাহেব বললেন, আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

আসলেই আমরা বিপদে আছি। আপনাদের নিরাপত্তার কথাটাও ভাবছি। বিপদ আপনাদেরও হতে পারে।

কীসের বিপদ?

আপনি বুঝবেন না, আসলে অল্প সময়ে আপনাদের বুঝাতে পারব না।

ঠিক আছে। আপনারা যা ভালো মনে করবেন তাই হবে।

আমাদের এক ঘণ্টা সময় দেন।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ওসি সাহেব চলে গেলে শাফায়েত আহমেদ কালু ফকিরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, একটা কিছু করুন। আমরা কীভাবে এগোব?

স্যার আমি নিজেও বুঝবার পারতেছি না। তয় ছুরিডা দরকার। আপনেগো বাসায় আছে। কাউরে বলেন নিয়া আসবার জন্য। প্রয়োজনে আমি ভেতরে যাব।

না, আপনি একা যাবেন না। আমিও যাব।

কখন যাব?

আরো খানিকটা সময় বিশ্রাম নিন। দুপুরের পর যাব। আগে

ছুরিডা আসুক।

এর মধ্যে খন্দকার যদি ওর কোনো ক্ষতি করে?

আমরা ঠ্যাকাবার পারব না। তয় আশার কথা হইল, দিনের বেলায় খন্দকারের কোনো শক্তি থাকে না। আমরা যাইয়া নিদিয়া আপারে নিয়া আসব।

ও কী আসবে?

আসার তো কথা। না আস্‌লে আর কী করব? আসলে তার মনের অবস্থা তো আমরা বুঝবার পারতেছি না।

শাফায়েত আহমেদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

রুবিনা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে। ধৈর্যহারা হইয়ো না।

আহারে! আমার মেয়েটা, কত ভালো ছিল, আর এখন কী অবস্থা!

কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করলেন শাফায়েত আহমেদ।

রুবিনা হঠাৎই যেন নিজেকে শক্ত করলেন। তারপর বললেন, ফকির বাবা, আমি রুবিনার মা। অনেক কষ্ট করে ওকে বড়ো করেছি। ওর সর্বনাশ আমি হতে দেবো না। আমি নিজেই যাব। ছুরি আনার ব্যবস্থা করছি। আপনি প্রস্তুত হন।

আমি প্রস্তুতই আছি।

পুলিশকে বলে দিচ্ছি। পুলিশও থাকবে আমাদের সাথে।

ঠিক আছে।

রুবিনা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বাইরে এসে ফোন করলেন ঢাকার বাসায়। ছুরিটা নিয়ে আসতে বললেন তাড়াতাড়ি। ছুরি আসামাত্র খন্দকারের বাড়িতে প্রবেশ করবেন, এমনই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

সকাল এগারোটার দিকে খন্দকারের বাড়িতে প্রবেশ করল সবাই। কালু ফকিরের পাশে শাফায়েত আহমেদ। তার পাশে রুবিনা। একজন মহিলা পুলিশ-সহ পাঁচজন পুলিশ আছে তাদের সাথে। আছেন ওসি আব্দুল হামিদ। তার দীর্ঘ তেইশ বছরের চাকরিজীবনে ছায়ামৃত্যু কিংবা আত্মা বেঁচে থাকার কাহিনি শোনেননি। সম্পূর্ণ বিষয়টা রহস্যময় হওয়ায় কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে।

ছুরিটা আছে কালু ফকিরের কাছে। ডান হাতে শক্ত করে ধরা। ওসি সাহেব-সহ সবাইকে তাবিজ নিতে বললেও কেউ নেয়নি। হালিম আসতে পারেনি। তার একটা দাঁত পড়ে গেছে। নড়ে গেছে আরো দুটো দাঁত। তার থেকে বড়ো কথা জ্বর এসেছে, লক্ষণ ভালো না।

মূল বাড়ির সামনে এসে থামল সবাই। শাফায়েত আহমেদ ওপরের দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠলেন, নিদিয়া, নিদিয়া।

কোনো উত্তর নেই।

আবার ডাকলেন তিনি।

না এবারও কোনো উত্তর এলো না।

ওসি সাহেব বললেন, উত্তর দেবে না কেন নিদিয়া?

বুঝতে পারছি না।

আমরা বরং ভেতরে যাই, চলুন।

ঠিক আছে।

প্রথমে দোতলায় এলো সবাই। না কোথাও দেখা যাচ্ছে না নিদিয়াকে। প্রত্যেকটা কক্ষের তালা ভেঙে ভেতরটা দেখা হলো। খাটের নিচে, বাথরুম, দরজার পেছনে কোনো জায়গায় বাদ গেল না। এক তলার প্রতিটি কক্ষও দেখা হলো। সেখানেও নেই নিদিয়া। ওসি সাহেব বললেন, তাহলে গেল কোথায়?

শাফায়েত সাহেব বললেন, ভূগর্ভস্থ কক্ষ আছে। ওখানে থাকতে পারে।

ওখানে যাবে কেন?

আসলে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ আমরা অশরীরী বিষয় নিয়ে কাজ করছি।

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, সত্যি কি আমরা অশরীরীয় কিছু মোকাবিলা করছি?

হ্যাঁ। চলুন নিচে যাই। ওখানে না পেলে পেছনে পুকুরের ওপাশে যাব, সম্পূর্ণ বাড়ি ঘুরে দেখব।

শাফায়েত আহমেদের অনুরোধে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামতে শুরু করল দুজন। নিচতলায় নামতে বোঝা গেল সবার মধ্যে অজানা ভয় কাজ করছে। পুলিশ সদস্যরা সচেতন হলেও চারদিকে লক্ষ্য রাখছে।

নিচতলার দুটি কক্ষই বাইরে থেকে আটকানো। ওসি সাহেব

বললেন, এখানেও থাকার সম্ভাবনা নেই। দরজাগুলো আটকানো।

শাফায়েত সাহেব তারপরও ডাক দিলেন, নিদিয়া, মা নিদিয়া।

চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

নিদিয়া নিদিয়া।

আবার ডাকলেন তিনি।

কোথাও খুট একটা শব্দ হলো। শাফায়েত আহমেদ আবার ডেকে উঠলেন, নিদিয়া নিদিয়া। শব্দের উৎস এবার বুঝতে পারলেন শাফায়েত আহমেদ। বললেন, মনে হচ্ছে সামনে কেউ দরজায় লাথি মারছে।

কথা বলতে বলতেই তিনি দরজাটা খুলে ফেললেন। দেখলেন সামনেই মেঝেতে পড়ে আছে নিদিয়া। চোখ, মুখ, হাত-পা বাঁধা। তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে গেলেন। নিদিয়ার অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না কিছুতেই।

নিদিয়া ঘুম থেকে উঠেছে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। মরার মতো ঘুমিয়েছে সে। প্রথম থেকেই স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে তাকে। এখনো শেষ হয়নি। শাফায়েত আহমেদ প্রথমে ঢাকায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরে মত পালটেছেন। ডাক্তারই বলেছে শারীরিক স্ট্যাবিলিটি প্রয়োজন, স্যালাইন দেওয়া শেষ হলে নেওয়া সম্ভব হবে। তা না হলে যে-কোনো সময় বড়ো ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। তাই অপেক্ষা করছেন তিনি।

মুখের দুপাশে দাগ হয়ে গেছে নিদিয়ার। ঠোঁটের একপাশটাও ফুলে আছে। চোখের নিচের অংশটা একেবারে কালো হয়ে গেছে। সমস্ত মুখে ক্লান্তির ছাপ। আজকের নিদিয়া আর সাতদিন আগের নিদিয়ার চেহারায় আকাশপাতাল পার্থক্য। মেয়ের চেহারা দেখে সারাদিনে কতবার চোখে পানি এসেছে বলতে পারবেন না শাফায়েত আহমেদ আর রুবিনা।

নিদিয়া চোখ খুললে রুবিনা জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন লাগছে মা?

শরীরে খুব জ্বালাপোড়া করছে মা।

কোথায়?

সমস্ত শরীর মা। সম্ভবত তোমাদের ঐ আদার তাবিজের জন্য। তোমরা বাইরে যাও মা।

কী বলছিস!

হ্যাঁ, খুব কষ্ট হচ্ছে।

শাফায়েত আহমেদ বললেন, আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোকে ঢাকায় নিয়ে যাব। অপেক্ষা করছিলাম কখন তার জ্ঞান আসে এজন্য। এই কুমিল্লায় তোর ভালো চিকিৎসা হবে না।

আমি ঢাকায় যাব না বাবা।

কেন?

তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। খন্দকার বড়ো ভয়ংকর। আমাকে ও নিয়ন্ত্রণ করে। আমি দুঃখিত বাবা, গতকাল তোমাকে ধাক্কা দিয়েছি। আসলে আমি দেইনি, দিতে বাধ্য হয়েছি। ঢাকা থেকেও আসতে চাইনি। আমাকে আসতে বাধ্য করেছে। আমি নিরুপায় বাবা। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।

কথা বলতে বলতে নিদিয়া খানিকটা ডানে সরিয়ে নিল শরীরটা। বোঝা যাচ্ছে তার শরীরে সত্যি জ্বালাপোড়া করছে। শাফায়েত আহমেদ আর রুবিনা নিজেরাও খানিকটা পেছনে সরে এলেন। নিদিয়া টেনে টেনে বলল, মা, জানালার পর্দাটা একটু সরাবে?

কেন?

আমি দিনের আলো দেখব।

পর্দা সরিয়ে দিলেন রুবিনা।

নিদিয়া বাইরে তাকিয়ে বলল, মা, সূর্য ডুবে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, তাই না?

হ্যাঁ।

আবার একটা ভয়ংকর রাত আসবে। হয়তো এই রাতটাই হবে আমার শেষ রাত।

কী বলছিস এসব!

বড়ো ভয়ংকর ঐ খন্দকারের আত্মা, একটা জানোয়ার মা, একটা জানোয়ার। তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি মুক্তি চাই, অথচ জানি না কীভাবে মুক্তি পাব। তোমরা অনেক কষ্ট করেছ। নাহিয়ান কি জানে আমার এই অবস্থার কথা?

না, আমরা জানাইনি।

জানিয়ো না। যদি মারা যাই বলবে, আমি ওকে বড়ো ভালোবাসতাম। সত্যি বড়ো ভালোবাসতাম।

শাফায়েত আহমেদ এবার বললেন, এসব কী বলছিস তুই। আমি এক্ষুনি ঢাকায় যাব। তারপর তোকে নিয়ে পরশুদিন যাব আমেরিকায়। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমাদের...

এমন সময় নার্স এসে জানাল ওসি সাহেব এসেছেন। শাফায়েত আহমেদ ভেতরে আসার অনুমতি দিলে ভেতরে প্রবেশ করলেন তিনি। নিদিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ওসি সাহেব বললেন, এখন কেমন লাগছে তোমার?

নিদিয়া ম্লান হেসে বলল, সন্ধ্যা হতে কতক্ষণ বাকি?

এই তো এখনই বোধহয় সূর্য ডুববে।

একটা কাজ করতে পারবেন?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, কী কাজ?

একটা শিকল দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখবেন।

কী বলছ তুমি!

নিদিয়া ম্লান হাসল। তারপর টেনে টেনে বলল, নইলে বোধহয় আপনারা আর আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। খন্দকারের আত্মার জেগে ওঠার সময় হয়ে এসেছে। খন্দকারের কথা আমাকে শুনতেই হবে। না শুনলে ও একজন একজন করে আমার বাবা-মা সবাইকে হত্যা করবে। আমি চাই না, আমার জন্য কারো মৃত্যু হোক।

শাফায়েত আহমেদ এবার এগিয়ে এসে বললেন, এসব তুই কী বলছিস মা!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল নিদিয়া। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে টেনে টেনে বলল, সূর্য অস্ত যাচ্ছে বাবা, সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য তো অস্ত যাবেই।

আজকের সন্ধ্যাটাই আমার জীবনের শেষ সন্ধ্যা হয়তো।

এবার ওসি সাহেব বললেন, তুমি খুব ভয় পাচ্ছ নিদিয়া। এতটা ভয় পাবে না। আমরা আছি। আমরা তোমাকে রক্ষা করব।

আপনি পারবেন না।

কেন?

কারণ সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

তাতে কী?

ঐ যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখুন। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারপাশটা। আসছে, ও আসছে।

কে?

নিদিয়া জানালার দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে বলতে থাকল, খন্দকার। খন্দকারের আত্মা। কী ভয়ংকর। আমি দেখতে পাচ্ছি, আসছে ভয়ংকর, খুনি খন্দকার আসছে। ঐ খন্দকারই এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে তিনজনকে হত্যা করছিল তার বাড়িতে। তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছিল। ঐ আত্মহত্যা ছিল অতৃপ্তির আত্মহত্যা।

এজন্য তার মৃত্যু আসল মৃত্যু ছিল না। ছিল ছায়ামৃত্যু। ঐ ছায়া বেঁচে আছে এখনো। জেগে উঠছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠবে। তারপর... তারপর... ক...ষ্ট... ক...ষ্ট...উহ্... উহ্...। এত ক...ষ্ট যে সহ্য করা যায় না।

ওসি সাহেব ঝুঁকে এসে বললেন, কীসের কষ্ট?

বুক ভরা কষ্ট, সমস্ত শরীরে কষ্ট, বড়ো কষ্ট, ক...ষ্ট... আর পারছি না, না...না...

আর কথা বলতে পারল না নিদিয়া। দেখে বোঝা যাচ্ছে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শরীর বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মতো। চোখ দিয়ে গলগল করে পানি বেরিয়ে আসছে। নিদিয়াকে যে ভয়াবহ যন্ত্রণাভোগ করতে হচ্ছে যে-কেউ দেখলে তা বুঝতে পারবে।

দূরে অনেক দূরে এর মধ্যে ডুবে গেছে সূর্য। কেউ ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারল না কী ভয়ানক এক রাত অপেক্ষা করছে সবার জন্য।

নিদিয়া যেন হঠাৎই শক্তি ফিরে পেল। উঠে বসল বিছানায়। তারপর সোজা হাঁটতে শুরু করল। শাফায়েত আহমেদ অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছিস মা?

নিদিয়া কোনো কথা বলল না, হাঁটতেই থাকল।

রুবিনা এবার এগিয়ে এলেন। পাশ থেকে হাত টেনে ধরে বললেন, কোথায় যাস?

পুরুষালি কণ্ঠে নিদিয়া ধমকে উঠল, ভাগ তুই, ভাগ।

ওসি সাহেব বড়ো অবাক হলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। কিছুক্ষণ আগের মেয়েটি এরকম রূঢ় হচ্ছে কীভাবে? তার ওপর আবার কণ্ঠ পুরুষের। তার সাথে চারজন পুরুষ ফোর্স ছিল। দুজন নারী পুলিশও নিয়ে এসেছিলেন। ক্লিনিকের বাইরে আসতে নারী দুই পুলিশ সদস্যকে বললেন নিদিয়াকে আটকাতে।

তারা দুপাশ থেকে গিয়ে হাত ধরেও আটকে রাখতে পারল না। রাস্তায় নেমে এলো নিদিয়া। তারপর হাঁটতে শুরু করল। যেদিকে যাচ্ছে খন্দকারের বাড়িটা ওদিকেই। শাফায়েত আহমেদ বললেন, নিদিয়া আবার খন্দকার বাড়িতে গিয়ে ঢুকবে।

ওসি সাহেব বললেন, আমি কি তাকে গ্রেফতার করব?

না।

তাহলে?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ওকে ঐ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

ওসি সাহেব ওয়াকি-টকিতে আরো চারজন নারী পুলিশকে খন্দকার বাড়িতে পাঠাতে বললেন। ক্লিনিক থেকে দুই কিলোমিটার দূরে খন্দকার বাড়ি। তারা সবাই হেঁটে যাচ্ছেন। রাস্তার সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, আসল ঘটনা কী যেন বুঝতে চেষ্টা

করছে। রুবিনা অবশ্য আসতে পারেননি। মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে শরীরে শক্তি পাচ্ছেন না।

পুলিশ পথে আরেকবার চেষ্টা করল নিদিয়াকে গাড়িতে ওঠানোর, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। নিদিয়ার শরীরে যথেষ্ট শক্তি, যা থাকার কথা নয়। সবকিছুর হিসাব মিলাতে পারছেন না ওসি সাহেব। অশরীরীয় খন্দকারের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুধাবন করছেন তিনি। এর মধ্যে কালু ফকিরের সাথেও পরিচয় হয়েছে তার। ছুরিটা দিয়েই যে হত্যা করতে হবে খন্দকারের আত্মাকে এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

নারী পুলিশের স্বল্পতার জন্য চারজন পাওয়া যায়নি। নতুন নারী পুলিশ পাওয়া গেছে দুইজন, আগে ছিল দুইজন। এই চারজন খন্দকার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের পেছনে পুরুষ আরো চারজন পুলিশ। আগে থেকেই একটা অ্যাম্বুলেন্স রাখতে বলেছিলেন ওসি সাহেব। সিদ্ধান্ত দিয়েছেন নিদিয়াকে ধরে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে ফেলা হবে। তারপর সরাসরি নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকায়। শাফায়েত আহমেদ সম্মতিও দিয়েছেন।

নিদিয়া গেটের কাছাকাছি পৌঁছাতেই ওসি সাহেব নির্দেশ দিলেন তাকে আটকানোর। সাথে সাথে চার নারী কনস্টেবল জাপটে ধরল নিদিয়াকে। নিদিয়া মুহূর্তের মধ্যে ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তারপর দ্রুত এগোতে লাগল গেটের দিকে। একজন পুরুষ পুলিশ তার সামনে পড়তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো তাকে। ধাক্কাটা এত জোরে লাগল যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না পুরুষ পুলিশ, উলটে পড়ল মাটিতে। দ্বিতীয় আরেকজন এগিয়ে এলে একহাতে গলা টিপে ধরল তার। তারপর উঁচু করল মাটি থেকে। পুলিশের পা এখন মাটি থেকে ছয় ইঞ্চি উঁচুতে। ওসি সাহেব-সহ সবাই অবাক হয়ে গেলেন নিদিয়ার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা দেকে। অবশ্য দেরি করলেন না তিনি। সবাই মিলে একসাথে ধাক্কা দিলো নিদিয়াকে। নিদিয়া সরে গেলেও ছাড়ল না কনস্টেবলকে। গলা ধরে টেনে ঢুকে গেল গেটের মধ্যে। তারপর এগোতে থাকল সামনের দিকে।

নিদিয়াকে আটকাবে কী! কনস্টেবলকে বাঁচানোই এখন মূল দায়িত্ব হয়ে পড়েছে ওসি সাহেবের। তিনি বুঝতে পারছেন দেরি হলে

সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই নিজের পিস্তল থেকে ফাঁকা গুলি ছুড়লেন। পাশের অফিসারকে নির্দেশ দিলেন শর্টগানের ফাঁকা গুলি করার জন্য। তারপর ছুটতে শুরু করলেন নিদিয়াকে উদ্দেশ করে। নিদিয়া অবশ্য ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে কনস্টেবলকে। ঢুকে গেছে মূল বাড়িতে।

কনস্টেবলকে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সে করে ক্লিনিকে পাঠিয়ে দিলেন ওসি সাহেব। তারপর শাফায়েত আহমেদকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি সত্যি বিস্মিত!

আগেই বলেছিলাম আপনাকে।

নিদিয়ার মাঝে আসলেই অশরীরীয় কোনো আত্মা আছে। আমি এখন বিশ্বাস করছি।

কীভাবে তাকে উদ্ধার করতে পারব?

আমার মনে হয় না স্বাভাবিকভাবে সম্ভব। আপনাকে বড়ো ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কী সিদ্ধান্ত।

প্রয়োজনে আমাদের গুলি করার অনুমোদন দিতে হবে।

শাফায়েত আহমেদ চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, কী বলছেন আপনি! আপনি নিদিয়াকে গুলি করবেন! আর সেই অনুমোদন আমি দেবো!

বলেছি প্রয়োজনে।

না না, আমাদের একমাত্র মেয়ে। আমি কখনোই এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত দেবো না। ও যদি এভাবে বেঁচে থাকে, থাকুক। তারপরও তো বেঁচে থাকবে।

আমি থানা থেকে আসছি। অতিরিক্ত ফোর্স নিয়ে আসব।

আচ্ছা।

চলে গেলেন ওসি সাহেব।

কালু ফকির পাশে ছিল। শাফায়েত আহমেদ বললেন, আমরা কি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারব?

স্যার আপনের কী মাথা খারাপ! এখন সন্ধ্যা। খন্দকারের আত্মা নিজের বাড়িতে রাইতে সবচাইতে ক্ষমতাধর হয়। এহন ভেতরে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

নিদিয়ার কী হবে তাহলে?

একটা উপায় বাইর করা লাগবে।

কী উপায় বের করবে। আমাদের আদার তাবিজ আছে। খন্দকার আমাদের কাছে আসবে কীভাবে?

এই বাড়ির মইধ্যে আদার তাবিজের ওপর আমি ভরসা করবার পারতেছি না। তারপরও যদি আপনি চান তাইলে ভেতরে ঢুকবার পারি। তয় বেশি মানুষজন লাগবে। লাগবে পুলিশও।

মানুষ পাব কোথায়?

এই এলাকার সবাইরে বলা লাগবে।

আমার তো পরিচিত তেমন কেউ নেই।

চেয়ারম্যানরে বইলা দেখবার পারেন।

আমার মাথা আর কাজ করছে না। আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন। শুধু আমার মেয়েটার যেন কোনো ক্ষতি না হয়, বড়ো আদরের মেয়ে আমার।

কথাগুলো বলতে বলতে শাফায়েত আহমেদ হাত দিয়ে চোখ মুছলেন।

রোমেল এসে পৌঁছেছে সন্ধ্যার পর। তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ফোন করেছিলেন রুবিনা, নিদিয়ার আম্মা। তার কাছ থেকে সবকিছু শুনে আর দেরি করতে পারেনি রোমেল। নিদিয়ার এরকম বিপদের দিনে সে দূরে থাকতে পারে না। কুমিল্লা এসে যখন শুনল যে নিদিয়া খন্দকারের বাড়িতে ঢুকেছে তখন একেবারে অস্থির হয়ে উঠল সে। এখানে পরিচিত তেমন কেউ নেই। কারো সাথে যে মন খুলে কথা বলবে সেই উপায়ও নেই। আর তাছাড়া নিদিয়াকে উদ্ধারের উপায় কী হবে সে বিষয়েও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পুলিশ অপেক্ষা করছে গেটের বাইরে। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। গেটের সামনে অবশ্য কালু ফকিরের সাথে পরিচয় হলো তার। তাকেই সে জানাল যে, ভেতরে যেতে চায়।

কালু ফকির ডানে-বামে মাথা নেড়ে বলল, ভেতরে যাবার পারেন, কিন্তু কোনো লাভ হবে না।

কেন? আমি খুঁজে বের করব নিদিয়াক।

তাকে আনবার তো পারবেন না।

আমরা সবাই মিলে যাই।

নিদিয়া আমাগো আক্রমণ করবে। আসলে নিদিয়া না, খন্দকারের আত্মা। একজনের পর একজনরে মারবার চেষ্টা করবে। পুলিশেগো গলা টিপা ধরছিল, কোনোমতে বাঁইচা আছে। আমাগো তহন কোনোকিছু করার থাকবে না। যদি তারে শিকল দিয়া বাইন্দা ফেলান যায়, তাইলে হয়তো কিছুটা লাভ হবে।

কতদিন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবেন?

যতদিন ঐ খন্দকারের আত্মা তারে ছাইড়া না যায়।

বিষয়টা অনিশ্চিত হয়ে যাবে না?

তা যাবে। অন্য কোনো উপায় নাই। যেহেতু আপনে বলতেছেন

যে আপনে তার স্বামী, আপনে রাজি হইলেই হয়। তয় আপনে আমি দুইজনে পারব না। মেলা মানুষ লাগবে। কারণ খন্দকারের শক্তি অনেক, চাইর-পাঁচজন তার সাথে পারবে না।

আদার তাবিজ নিয়া গেলাম।

এই বাড়ির মইধ্যে আদার তাবিজের জোর কম। আসলে জোর কম না। খন্দকারের শক্তি বেশি, এইজন্য আদার তাবিজের শক্তি কইমা যায়। তয় উপায় ঐ একটাই, যেমনে হোক ছুরি দিয়া মারা লাগবে ঐ খন্দকারের আত্মারে।

ছুরিটা কোথায়?

আছে আমার কাছে।

আমাকে দেন।

ছুরি দিয়া কী করবেন আপনে?

আমি ভেতরে যাব।

মানে!

জ্বি ফকির বাবা। আমি ঐরকমই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি খন্দকারের বাড়ির ভেতরে যাব। উদ্ধার করব নিদিয়াকে।

আপনের কি মাথা খারাপ? ঐ খন্দকাররে দেখলে আপনি ভয়েই মইরা যাবেন।

আপনি কী দেখেছেন?

না দেখি নাই।

আমি দেখেছি। নিদিয়ার মধ্যেই দেখেছি। আমার বাসায় আমার ওপর চড়াও হয়েছিল। এখন আর ভয় পাব না। আমি ভেতরে যাবই যাব। কেন যাব জানেন? নিদিয়ার ভালোবাসার মূল্য দেওয়ার জন্য। আমাকে ভালোবাসে বলেই আমাকে বিয়ে করার মতো সাহস তার ছিল। সে ছিল একেবারে অসহায়। কেউ যখন কিছু করতে পারছিল না, তখন এসেছিল আমার কাছে, সাহায্যের জন্য। আমিও তাকে তেমন সাহায্য করতে পারিনি। কিন্তু এখন করব?

আপনে ভুল করবেন।

না ভুল করছি না, এখনই সময়। নিদিয়া তার ভালোবাসাকে প্রমাণ করেছে, আমি পারিনি। আমি প্রমাণ করতে চাই, আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমার বেঁচে থাকার জন্য তাকে আমার প্রয়োজন,

বড়ো প্রয়োজন। নিদিয়াকে ছাড়া আমার জীবন মূল্যহীন। আপনি আমাকে ছুরিটা দেন।

আপনে আবেগপ্রবণ হইয়া কথা বলতেছেন।

না, আমি মন থেকেই বলছি। প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি।

আরো ভাবতে হবে আপনের।

না, ভাবাভাবির কিছু নেই। আপনার কাছে এতটুকু সাহায্য চাইব, যে ছুরিটা আমাকে দেবেন। না দিলে আমি ছুরি ছাড়াই যাব। আমার কী মনে হয় জানেন? ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি করলে সবকিছু হারাতে হবে। খন্দকার বাঁচতে দেবে না নিদিয়াকে। কিন্তু নিদিয়াকে আমার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

সত্যই একলা যাবেন।

হ্যাঁ। আর কাউকে পাব কোথায়? দেন ছুরিটা দেন।

কালু ফকির তার ঝোলা থেকে ছুরিটা বের করল। তারপর বলল, আসলে এই বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি আমি আপনেরে দিবার পারব না। বাড়ির মালিক শাফায়েত আহমেদ স্যার। তার অনুমতি লাগবে।

আমি আর কারো সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না। তাতে শুধু সময় নষ্ট হবে। সত্যি কথা বলতে কী, সবাই আমাকে নিষেধ করবে। তাই যদি হয়, তাহলে কে উদ্ধার করতে যাবে নিদিয়াকে?

পুলিশ অপেক্ষা করতে বলছিল।

আপনি অপেক্ষা করতে বলছেন। এভাবে দেরি করা যাবে না। দেন ছুরিটা দেন।

কালু ফকির সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেও শেষ পর্যায়ে ছুরিটা তুলে দিলো রোমেলের হাতে। রোমেল পা বাড়াল গেটের দিকে। পেছন থেকে ডাক দিলো কালু ফকির। তারপর একটা তাবিজ এগিয়ে দিয়ে বলল, এই তাবিজটা আদার তাবিজ। গলায় পরেন। এই তাবিজ আপনেরে রক্ষা করবে।

কথা বলতে বলতে তাবিজটা রোমেলের গলায় পরিয়ে দিলো কালু ফকির। তারপর বিড়বিড় করে দোয়া পড়ে ফুঁ দিলো মাথায়। শেষে বলল, দোয়া করি সুস্থমতো ফিরা আসেন।

রোমেল আর কোনো কথা বলল না। ছুরি হাতে ভেতরে প্রবেশ করল। কালু ফকির রোমেলের পথের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে

দুই হাত তুলে মোনাজাত করা শুরু করল।

রোমেল হাঁটছে। তার হাঁটার গতি বেশ দ্রুত। সামনে এখন দেখা যাচ্ছে বাড়িটাকে। এই প্রথম সে এই বাড়িতে এসেছে। বিশাল বড়ো বাড়ি। কোথায় আছে নিদিয়া, জানে না সে। খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা যে অত্যন্ত কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ, বুঝতে পারছে। তারপরও তাকে করতে হবে। করতে হবে তার স্ত্রীর জন্য, তার প্রথম প্রেম আর ভালোবাসার জন্য।

অর্ধেক পথ আসতে থমকে দাঁড়াল রোমেল। তার মনে হতে লগাল কেউ একজন আসছে পেছনে। নিজের অজান্তেই শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল তার। শক্তভাবে ধরল ছুরিটা। তারপর হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল।

যা ভেবেছিল তাই, দ্রুত হেঁটে আসছে একজন। তবে মুখে আলো পড়তে বুঝতে পারল কালু ফকির। কাছে এসে বলল, থাকতে পারলাম না, আপনেরে একা যাবার দিবার পারি না।

আমি ভাবিনি যে আপনি আসবেন।

আমার নিজের একটা দায়িত্ব আছে না? চলেন যাই।

দুজনে আবার হাঁটতে শুরু করল। বাড়ির সিঁড়ির কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল তারা। সামনের কোলাপ্সিব্ল গেট খোলা। ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু এখন কোথায় খুঁজবে নিদিয়াকে?

দোতলায় বেডরুমে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে নিদিয়া। খুব ক্লান্ত লাগছে তার। হাঁপাচ্ছেও। খানিকটা দূরে খন্দকারের ছায়া দেখতে পাচ্ছে সে। একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছে। চেহারাটা অস্পষ্ট। এখন উঠে দাঁড়িয়েছে, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। যতই কাছে আসছে ততই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চেহারা। যখন বিছানায় এসে বসল তখন সম্পূর্ণই স্পষ্ট হয়ে উঠল অবয়ব।

নিদিয়ার চুলে হাত রেখে খন্দকার বলল, আমি আশা করছিলাম সকালে তুমি বোধহয় আমারে ছাইড়া যাবা না। অথচ তুমি চইলা গেছ। কামডা তুমি ঠিক করো নাই।

কিছু বলল না নিদিয়া।

খন্দকার কুৎসিত হেসে টেনে টেনে বলল, আমি কিন্তু আর আগের মতো হৃদয়বান থাকব না। এখন থাইকা বড়ো নিষ্ঠুর আচরণ করব। যে কথা তোমারে বলতেছিলাম, কেউ যদি তোমারে উদ্ধার করবার আসে, আমার কাছ থাইকা নিয়া যাবার আসে, নিশ্চিত তারে আমি মাইরা ফেলাব। আর ক্ষমা করব না। আমার প্রিয়তমারে আমি আর আমার কাছ থাইকা কাউরে ছিনায় নিবার দিব না। তোমার অপেক্ষায় বইসা থাকতে থাকতে ক্লান্ত হইয়া গেছিলাম। চল্লিশ বছর পর তোমারে পাইছি। আর হাতছাড়া করব না। তুমি আর আমি থাকব, এই বাড়িতে থাকব। হাজার বছর থাকব। তুমি হয়তো ভাবতেছ হাজার বছর তুমি বাঁচবা ক্যামনে? আমি ব্যবস্থা কইরা দিব। চিন্তা করবা না। আমরা দুইজন হব শুধুই দুইজনের। কী বলো তুমি?

নিদিয়া আগের মতোই চুপ থাকল।

কথা বলো না ক্যান? তুমি কিন্তু আমারে রাগায় দিতেছ। এইডা ঠিক হইতেছে না। তোমার বুঝতে হবে আমি তোমার স্বামী। তোমারে পছন্দ করি। তোমার বাকি জীবনডা আমার সাথেই থাকা লাগবে। কাজেই অহেতুক কষ্ট পাইয়ো না। আর আমারে রাগাবা না। রাগলে আমার মাথা

ঠিক থাকে না। আমার সাথে মিলামিশা থাকবা, আমারে সব সময় খুশি করবা। ঠিক আছে?

এবারও নিদিয়া কোনো কথা বলল না।

খন্দকার প্রচণ্ড রেগে গেল। হঠাৎই পেছন থেকে নিদিয়ার চুল ধরে টেনে মাথাটা উঁচু করল। তারপর নিচে সামনে ঝুঁকে বলল, কথা বলতেছ না ক্যান?

ব্যথায় কুঁকড়ে গেল নিদিয়া। তার মনে হলো মাথার চুল বুঝি সব উঠে যাবে। তাড়াতাড়ি বলল, কথা বলব।

বল আমারে খুশি করবি।

হ্যাঁ করব।

আমি যা বলব সব শুনবি।

হ্যাঁ শুনব।

আমারে ছাইড়া আর যাবি না।

না যাব না।

চুল ছেড়ে দিলো খন্দকার। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কমলা রঙের শাড়ি বড়ো পছন্দ করি। নিচে ঘরের মইধ্যে আছে। নিয়া আসতেছি। তুই ঐ শাড়ি পরবি। তারপর দুইজনে টাওয়ারের ওপর যাব। ঐখানে মাঝরাইত পর্যন্ত থাকব।

কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল খন্দকার। নিদিয়া শুয়েই থাকল। কীভাবে এখানে এসেছে ঠিক যেন মনে করতে পারছে না। এভাবে এই বাড়িতে যে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না সেটা অবশ্য সে বুঝতে পারছে। কিন্তু মুক্তির জন্য চেষ্টা করে যে লাভ নেই। সে যেখানেই যাচ্ছে খন্দকার সেখানেই হাজির হচ্ছে, হোক তা ক্লিনিক কিংবা ঢাকা। এক্ষেত্রে মুক্তির একমাত্র উপায় খন্দকারকে হত্যা করা। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়, কারণ ছুরিটা তার কাছে নেই।

খন্দকার নতুন শাড়ি নিয়ে ফিরে এলো। তারপর আগের বিছানায় বসে বলল, এই শাড়ি পইরা নাও।

'তুই' সম্বোধন থেকে আবার 'তুমি' সম্বোধন করছে খন্দকার।

নিদিয়া শুয়ে থেকেই বলল, আমি পারব না।

চড়া গলায় খন্দকার বলল, কেন?

আমার শরীর খুব দুর্বল লাগছে, মাথা ঘুরছে।

তাইলে চলো ওপরে টাওয়ারে যাই, খোলা বাতাসে ভালো

লাগবে।

না।

কেন?

এখানেই থাকব।

গলা এবার আরো চড়া হলো খন্দকারের। বলতে থাকল, আমার সহ্যের সীমা ছাড়ায় যাইতেছে। আমি যা বলতেছি তুমি তা অস্বীকার করতেছ। এইডা ভালো লক্ষণ না। শরীর খারাপ, বাইরা গেলে ভালো লাগবে। চলো ওপরে উঠি। আর যদি মনে কইরা থাকো, আমার সাথে কথা বলবা না, ঘুরবার যাবা না, তাও কও। ক্যামনে কথা বাইর করতে হয়, ক্যামনে ঘুরবার নিয়া যাইতে হয়, ঐ উপায় আমার জানা আছে।

কথাগুলো বলতে বলতে আবার চুল ধরে টান দিলো খন্দকার। নিদিয়া বুঝল খন্দকারের অবাধ্য হওয়ার উপায় তার নেই। তাই কষ্ট হলেও উঠে বসল। পা বাড়াল টাওয়ারের উদ্দেশে। অর্ধেক উঠে যখন আর সে পারছে না, খন্দকার তখন তার হাত ধরল। তারপর টেনে উঠিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ওপরে। এই টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা নেই, শুধুই যেন রাগ আর ক্ষোভ।

অবশেষে টাওয়ারের ওপর উঠতে পারল নিদিয়া। অতিরিক্ত দুর্বলতার জন্য পড়ে যাচ্ছিল সে। খন্দকার তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। নিদিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। খন্দকার বিড়বিড় করে বলল, না তুমি আজ দূরে যাবা না, আমার কাছে থাকবা। ঐ যে দ্যাখো চাঁদ, কী সুন্দর!

নিদিয়া চোখ তুলে তাকাল। চাঁদটাকে মোটেও সুন্দর মনে হচ্ছে না। একচিলতে দেখা যাচ্ছে, বাকি অংশ মেঘে ঢাকা।

কী সুন্দর না?

আবার প্রশ্ন করল খন্দকার।

নিদিয়া বলল, না, মোটেও সুন্দর না।

কেন?

পূর্ণিমার চাঁদ সুন্দর, এই চাঁদ নয়।

তোমাকে নিয়ে আমি পূর্ণিমার চাঁদও দেখব। তুমি যা চাবা তাই হবে। শুধু তুমি আমার হবা, শুধুই আমার। আমি তোমাকে চাই, শুধু

আমার মতো করে চাই। এসো আমার কাছে এসো, আরো কাছে এসো।

কথাগুলো বলে খন্দকার টেনে আরো কাছে নেওয়ার চেষ্টা করল নিদিয়াকে। নিদিয়া ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল খন্দকার। নিদিয়াকে চেপে ধরল নিজের মধ্যে। তারপর মুখ নিয়ে আসতে লাগল নিদিয়ার ঠোঁটের দিকে। নিদিয়া ভয় আর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

খন্দকার রাগে কষে একটা চড় হাঁকাল নিদিয়ার গালে।

নিদিয়ার মনে হলো সে চোখে অন্ধকার দেখছে। ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না সে। পড়ে গেল নিচে মেঝেতে। খুব ভীত হয়ে পড়লেও দূরে তার নাম ধরে কারো ডাক শুনতে পেল সে। ডাকটা খন্দকারও শুনেছে। তাই নিদিয়াকে ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল সে। তার চোখেমুখে যেন আগুন ঝরছে।

এদিকে নিদিয়ার চিৎকার কানে এসেছে রোমেলের। বলল, কোন দিক থেকে এলো চিৎকারটা?

ঐ টাওয়ার থাইকা।

ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল কালু ফকির।

আমরা এখনই উঠব।

চলেন।

টাওয়ারে উঠতে গেলে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে হবে। কারণ সিঁড়িটা বাড়ির ভেতর থেকে ওপরে উঠে গেছে।

বারান্দায় পরা খাতেই কালু ফকির বলল, খুব সাবধান থাকতে হবে আমাগো।

আমাদের কাছে আদার তাবিজ আছে। খন্দকার তো আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

কী যে করে বলা মুশকিল। আমাগো হয়তো স্পর্শ করবার পারবে না। কিন্তু ওর শক্তি মেলা বেশি। কীভাবে কী করে বুঝা কঠিন। আমাগো...

কথা শেষ করতে পারল না কালু ফকির। বারান্দার শেষ মাথায় যেখান থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি শুরু হয়েছে সেখানে খন্দকারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা। এই প্রথম নিদিয়া ছাড়া কেউ

খন্দকারকে দেখল। শরীরে ধূসর রঙের একটা পোশাক পরা। হাতে একটা লম্বা ধাতব পানির পাইপ।

কালু ফকির কিছু বলার আগেই খন্দকার টেনে টেনে বলল, আমার বাড়িতে তোরা আইছস ক্যান?

সাহস করে কালু ফকির বলল, নিদিয়া আপা কোথায়?

ক্যান?

তারে নিবার আইছি।

নিদিয়া আমার স্ত্রী, আমার বউ। তারে তুই নিবি ক্যান।

না তুই মিথ্যা বলতেছস। নিদিয়ার স্বামী রোমেল, আমার পাশে আছে। সে তার স্ত্রীরে নিবার আইছে। আমাগো কাছে তারে দিয়া দে।

খন্দকার বড়ো বড়ো চোখে তাকাল রোমেলের দিকে। তারপর বলল, ওরে চিনি, ওর বাড়িতে আমি ওরে ছাইড়া দিছিলাম। কিন্তু আইজ আর তোগো কাউরে ছাড়ব না।

রোমেল এবার নিজেও বলল, খন্দকার, আমিও তোকে ছাড়ব না। তোকে হত্যা করবই।

খন্দকার কিছুক্ষণ স্থির থাকল। তারপর পাইপটা হাতে নিয়ে ছুটে আসলো সামনের দিকে। কালু ফকিরের হাতে একটা আদার মালা ছিল। কালু ফকির ঐ মালা খন্দকারের গালায় পরিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা করেছিল মনে মনে। কিন্তু পারল না। ধাতব পাইপের আঘাতটা তার বাহুতে এত জোরে এসে আঘাত করল যে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পড়ে গেলে মেঝেতে। রোমেল এগিয়ে যেতে তাকেও পাইপ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল খন্দকার। হাত দিয়ে ঠ্যাকানোর চেষ্টা করে ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে। দ্বিতীয় আঘাতে তার হাত থেকে পড়ে গেল ছুরিটা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। এই মুহূর্তে আদার তাবিজ কোনো কাজে আসছে না। কারণ খন্দকার কাছে না এসে দূর থেকে পাইপ দিয়ে আঘাত করছে তাদের।

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে কালু ফকির। ব্যাগের মধ্যে থেকে আদার গুঁড়া হাতে নিয়ে ছুড়ে দিলো খন্দকারের দিকে। খন্দকার চিৎকার করে খানিকটা পিছিয়ে গেলেও আবার ফিরে এলো। তার এবারের আঘাতটা সরাসরি লাগল কালু ফকিরের মাথায়। তাতে মাথা ধরে মেঝেতে বসে পড়ল কালু ফকির। পরের আঘাতে একেবারে শুয়ে

পড়তে বাধ্য হলো।

এরপরও ক্ষান্ত হলো না খন্দকার। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ধাতব পাইপটা সরাসরি ঢুকিয়ে দিলো কালু ফকিরের পেটের মধ্যে। কালু ফকির মুখ দিয়ে কক শব্দ করে ধরে বসল পাইপটা। কিন্তু কিছু করতে পারল না। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। শেষমুহূর্তে শুধু বিড়বিড় করে বলল, আ...আমি পা...রলাম না, পা...রলাম না।

এরপরই নিস্তেজ হয়ে গেল কালু ফকিরের শরীর।

রোমেল ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি এভাবে পরাজিত হতে হবে তাদের দুজনকে। খন্দকারের নিষ্ঠুরতাও তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। খন্দকার কাছে আসতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু সে যে এভাবে একটা পাইপ নিয়ে এসে আক্রমণ করে বসবে তা তার ধারণায়ও ছিল না। আগের দিন নিদিয়ারূপী খন্দকার এতটা নির্মম, নিষ্ঠুর ছিল না। আজ যেন ভয়ংকর এক পিশাচ হয়ে উঠেছে। এখন এগিয়ে আসছে এদিকে। হাতে লম্বা ধাতব পাইপ। নিজেকে রক্ষার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না রোমেল। ছুরিটা আট-দশ ফুট দূরে। অতটা দূরত্ব তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। হাত-পা কাঁপছে, চোখের দৃষ্টিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসেবে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে।

খন্দকার ডানে-বামে মাথা নেড়ে বুঝাতে চাইল যে পারবে না সে। তারপর হঠাৎই পাইপ দিয়ে ভয়ংকর এক আঘাত করল তাকে। শেষমুহূর্তে হাত দিয়ে ঠ্যাকাতে পারলেও লাভ হলো না। আঘাতের ধাক্কাটা এসে মাথায়ও লাগল। উলটো ঘুরে পড়ে গেল সে। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত।

রোমেল মাথা উঁচু করার চেষ্টা করেও পারল না। চোখের সামনে সবকিছু কাঁপতে শুরু করেছে। খন্দকারের চেহারাটাও কাঁপছে। তবে তার মুখের বাঁকা হাসিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাসতে হাসতে সে বলল, আগেরদিন তোরে মাফ করছি। আইজ করব না।

রোমেল কোনো কথা বলল না।

খন্দকার বলতে থাকল, আমার সম্পর্কে তোর কোনো ধারণা নাই, ধারণা নাই আমার শাক্তি সম্পর্কে। তার থাইকা বড়ো কথা আমার ভালোবাসা সম্পর্কে তুই কিছুই জানস না। আমি আমার স্ত্রীরে ভালোবাসি, পাগলের মতো ভালোবাসি। তুই আমার বউ, স্ত্রীর দিকে

হাত বাড়াইছস, তোর হাত আমি ভাইঙ্গা ফেলাব।

কথাগুলো বলতে বলতে খন্দকার সত্যি পাইপ দিয়ে ভয়ংকর এক আঘাত হানল রোমেলের বাম হাতে। সাথে সাথে হাড় ভাঙার শব্দ হলো। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল রোমেল। দ্বিতীয় আঘাতটা লাগল তার পায়ে। মনে হলো কেউ বুঝি তার পা শরীর থেকে কেটে ফেলে দিচ্ছে। চোখ দিয়ে গলগল করে পানি বের হয়ে এলো।

লাঠিটা আবার ওপরে তুলতে পেছনে চিৎকার শোনা গেল এক নারীকণ্ঠের, খবরদার! রোমেলকে মারবেন না।

রোমেল দেখল নিদিয়া নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। তাবে সে ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। শরীর কাঁপছে। সিঁড়ির রেলিং ছেড়ে দিতে ধপ করে নিচে পড়ে গেল। খন্দকারের চোখদুটো এর মধ্যে বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। চিৎকার করে উঠে বলল, আবার তুই এইখানে আইছস?

নিদিয়া হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে বলল, দোহাই আপনার, ওর কোনো ক্ষতি করবেন না।

ক্যান?

ওর কোনো দোষ নেই। আমিই ওকে জোর করে বিয়ে করেছি।

তুই নিজে বিয়া করছস?

হ্যাঁ নিজে, কারণ আমি রোমেলকে ভালোবাসি।

না, তুই কাউরে ভালোবাসবার পারস না। শুধু আমারেই ভালোবাসবি। শুধুই আমারে। আর এজন্যই আমি রোমেলরে হত্যা করব। তারপর তোরে নিয়া সুখেশান্তিতে থাকব।

খন্দকারের কথা বলার মাঝেই ছুরিটা হাতে তুলে নিল নিদিয়া। তারপর উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। খুবই দুর্বল তার শরীর।

নিদিয়ার হাতে ছুরি দেখে খন্দকারের বাঁকা হাসিটা বিস্তৃত হলো। বলল, ভাবতেছস ঐ ছুরি দিয়া আমারে হত্যা করবি? পারবি না। কেন জানস, তুই আমার কাছে আসবার পারবি না, তার আগেই আমি তোর মইধ্যে প্রবেশ করব। তারপর কী করব, জানস? না জানস না। তোর হাত দিয়া খুন করাব তোর প্রিয় রোমেলরে, হা হা হা হা।

নিদিয়াও টেনে টেনে বলল, আমি তোরে ঐ সুযোগ দেবো না।

পারবি না আমার সাথে।

আমি পারব। জীবন থাকতে আমি রোমেলরে হত্যা করতে দেবো না, না।

কথাগুলো বলতে বলতে শরীরের সর্বোচ্চ শক্তিতে উঠে দাঁড়াল নিদিয়া। তারপর ছুরি হাতে ছুটে যেতে লাগল খন্দকারের দিকে। দুই কদম এগোনোর পরই থমকে যেতে বাধ্য হলো সে। খন্দকার নেই, কোথাও নেই। মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। সামনে, পেছনে, চারপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না খন্দকারকে।

নিদিয়া এবার তাকাল রোমেলের দিকে। রোমেল মেঝেতে পড়ে আছে। তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসছে তাজা রক্ত। মাথা উঁচু করার শক্তি তার নেই। শুধু স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

রোমেলের দিকে এক পা এগোতেই কথা বলে উঠল খন্দকার, বলছিলাম না, তুই আমারে মারবার পারবি না।

জোরে শ্বাস নিল নিদিয়া। তারপর বলল, কেন পারব না।

আমি তোর শরীরের মইধ্যে। আমারে মরতে হইলে তোর নিজের মরা লাগবে। আমি তোরে মরতে দিব না, আমিও মরব না। আমরা হবো অমর। হা... হা... হা...

নিদিয়ার শরীর একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে পাশের দেওয়ালে হেলান দিলো। তারপর টেনে টেনে বলল, পারবি না, তুই পারবি না খন্দকার।

আমাকে তুই করে বলতেছিস কেন?

শুধু তুই না, তোর জন্য আরো খারাপ কিছু অপেক্ষা করতেছে।

আমার সাথে মশকরা করতেছস! আগে তোর পছন্দের মানুষরে হত্যা কইরা নেই, তারপর তোর সাথে বোঝাপড়া হবে।

নিদিয়া এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর তাকাল রোমেলের দিকে। রোমেল আগের মতোই পড়ে আছে, রক্তে ভিজে যাচ্ছে সমস্ত শরীর।

নিদিয়া অনুভব করল তাকে এখন পা বাড়াতে হচ্ছে রোমেলের দিকে। সে বুঝতে পারছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে খন্দকার। কিন্তু সুযোগটা সে দিতে চায় না। আর দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভয়ংকর কাজটা এখনই করতে হবে। তার হাতে আর সময় নেই। কারণ রোমেলকে সে বাঁচাবেই, কিছুতেই তাকে মরতে দেবে

না।

মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটাল নিদিয়া। সে নিজের পেটের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিলো। এরকম একটা পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না খন্দকার। জোরে চিৎকার করে উঠল সে। তারপর শুধু করতেই থাকল। যখন নিস্তেজ হয়ে এলো, তখন নিদিয়া নিজেও পড়ে গেল মেঝেতে। তার দৃষ্টি এখন শুধু রোমেলের দিকে।

চোখের সামনে ঘটল সবকিছু, রোমেল কিছু বলার চেষ্টা করেও পারল না। নিদিয়া, তার নিদিয়া আত্মহত্যা করেছে। তারই চোখের সামনে। অথচ কিছুই করতে পারল না সে, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়েছে। নিদিয়া নিজে আত্মহত্যা করে তাকে বাঁচিয়ে গেছে, প্রমাণ করে গেছে তার ভালোবাসা ছিল জীবনের চেয়েও বড়ো।

রোমেল কতক্ষণ এভাবে ছিল বলতে পারবে না। হঠাৎ সে দেখল নিদিয়ার শরীরের মধ্য থেকে বের হয়ে আসছে আর এক নিদিয়া। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে তার দিকে। অবাক হলো দেখে যে, নিদিয়া তাকে টেনে তুলল। তারপর হাঁটতে শুরু করল বাইরের গেটের দিকে। গেটের কাছে আসতে রোমেল অনেক কষ্টে জিজ্ঞেস করল, তুমি?

মিষ্টি করে হাসল নিদিয়া। তারপর বলল, হ্যাঁ, আমিই তোমার নিদিয়া। তবে আসল নিদিয়া নয়। নিদিয়ার আত্মা। সত্যি কথা বলতে কী জানো, আমি আত্মহত্যা করতে চাইনি, তারপরও করতে হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই মৃত্যু আসলে ছিল ছায়ামৃত্যু। এজন্য আমি তোমার কাছে আসতে পেরেছি, তোমার সাথে কথা বলতে পারছি। আশা করছি সারাটা জীবন তোমার সাথে কাটাতে পারব। আমাদের সম্পর্কে কিছুটা অপূর্ণতা থাকবে হয়তো, তবে কেউ আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

রোমেল কথা বলতে গিয়েও পারল না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। চেষ্টা করেও তাকিয়ে থাকতে পারছে না। এক সময় দাঁড়িয়ে থাকতেও পারল না। পড়ে গেল মাটিতে। তারপর জ্ঞান হারাল।

দূর থেকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ উদ্ধার করে রোমেলকে। তিন মাস লেগেছে তার সুস্থ হতে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সরাসরি সে চলে আসে খন্দকারের বাড়িতে। তারপর থেকে এই বাড়িতেই আছে। সারাদিন তার সাথে থাকে নিদিয়া। রাতে কথা বলে, হেঁটে বেড়ায়, গল্প করে। দূর থেকে কেউ অবশ্য নিদিয়াকে দেখতে পায় না। শুধু দেখে রোমেলকে। আর ভাবে, মানুষটা ভালোবাসার কারণে পাগল হয়ে গেছে। অথচ কেউ জানে না যে সে ভালোবাসার মানুষের সাথেই আছে। কারণ নিদিয়ার মৃত্যু হয়নি, হয়েছিল ছায়ামৃত্যু। কারো ছায়ামৃত্যু হলে সে বারবার ফিরে আসে, ফিরে আসে তার ভালোবাসার মানুষের কাছে।

ছায়ামৃত্যু উপন্যাসের রচনাকাল, পুলিশ অফিসার্স মেস, চট্টগ্রাম, ১৭.২.২০২০ - ২২.০৩.২০২০

ছায়ামৃত্যু

মোশতাক আহমেদ

প্রথম ফ্লাপ :

নিদিয়া বেড়াতে এসেছে কুমিল্লার খন্দকার বাড়িতে। বাড়িটি তার বাবা নতুন কিনেছে। বাড়িতে প্রবেশের পরই তার ওপর ভর করে খন্দকার, যার নাকি ছায়ামৃত্যু হয়েছিল। চল্লিশ বছর ধরে সে অপেক্ষা করছিল নিদিয়ার জন্য। কারণ নিদিয়ার চেহারা আর তার স্ত্রী লায়লার চেহারা হুবহু একইরকম। প্রথমে বিশ্বাস করেনি নিদিয়া। কিন্তু যখন ভূগর্ভস্থ কক্ষে লায়লার ছবি পাওয়া গেল তখন আর সত্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকল না, কারণ দুজনের চেহারায় কোনো পার্থক্য নেই।

নিদিয়া সিদ্ধান্ত নিল ত্যাগ করবে খন্দকার বাড়ি। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। খন্দকারের আত্মা অবস্থান নিয়েছে তার শরীরে। নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে তাকে, এখন তাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু নিদিয়া রাজি নয়। কারণ সে ভালোবাসে রোমেলকে। রোমেলের কথা জানতে পেরে খেপে ওঠে খন্দকার। সিদ্ধান্ত নেয় হত্যা করবে রোমেলকে।

নিদিয়াকে খন্দকারের আত্মা থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসে কালু ফকির। কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা একে একে ব্যর্থ হতে থাকে। এক সময় নির্জন বাড়িতে নিদিয়াকে একা বন্দি করে ফেলে খন্দকার। এখন আর কেউ নেই তাকে সাহায্য করার। নিদিয়াকে খন্দকারের বাধ্য এখন হতেই হবে, স্ত্রী হিসেবে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে খন্দকারের চাওয়াপাওয়ার কাছে। তা না হলে নিশ্চিত মৃত্যু?

শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল নিদিয়ার ভাগ্যে? সে কি ফিরে আসতে পেরেছিল স্বাভাবিক জীবনে? নাকি বরণ করতে হয়েছিল করুণ মৃত্যু?

লেখকের কথা

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমার লেখা সবচেয়ে ভয়ের উপন্যাস কোনটি। এখন পর্যন্ত বলব, 'অতৃপ্ত আত্মা' আমার প্রথম ভৌতিক উপন্যাস। বইটি পড়ার পরে অনেকেই বলেছেন ভয়ের মাত্রা যেন আমি কমিয়ে দেই, কারণ কিশোর বয়সের অনেক পাঠক উপন্যাসটি পড়ে। এরপর থেকে আমি সত্যি ভয়ের মাত্রা কমিয়ে দিতে শুরু করি। তবে ভাবছি ভবিষ্যতে ভয় আরো বাড়াব। কারণ ভৌতিক বইতে ভয় একটু বেশিই থাকা উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি।

আর হ্যাঁ, 'ছায়ামৃত্যু' উপন্যাসে বেশ কয়েকটি জায়গায় একই কথা বারবার (পুনরাবৃত্তি) বলা হয়েছে। এর কারণ, অল্পবয়সি পাঠকদের কাছে বাস্তব ও অশরীরীয় জগতের সম্পর্ককে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি উপন্যাসের স্বার্থে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে। সিরিয়াসধর্মী পাঠকদের কাছে এই পুনরাবৃত্তি বিরক্তির কারণ হতে পারে। তবে একটা বিষয় সত্য, আমি কখনোই চাই না, সিরিয়াসধর্মী কোনো পাঠক আমার ভৌতিক উপন্যাস পড়ুক। কারণ ভৌতিক উপন্যাসের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, তারা হয়তো হতাশ হবেন। আমি কাউকে হতাশ করতে চাই না। এই উপন্যাস শুধু ভূতপ্রেমিক পাঠকদের জন্য, যারা খুব সহজ, সরল এবং সাধারণ মনের। শুভকামনা।

ছায়ামৃত্যু উপন্যাসের রচনাকাল, পুলিশ অফিসার্স মেস, চট্টগ্রাম, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ২২শে মার্চ ২০২০।